# ভালোবাসা দিবস যেভাবে শুরু হলো

বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাস এখন সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয়। আমেরিকায় টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর থেকে বিশ্ব পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় ভয়ংকর যুদ্ধের যেমন আশংকা থাকছে তেমনি বিশ্ব জুড়ে অবিশ্বাস, সন্দেহও ঘনীভূত হচ্ছে। যেমন এরই মধ্যে মিথ্যা সন্দেহের শিকার হয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্ব জুড়েই এখন চলছে উদ্বেগ। এবং এই ঝুকিপূর্ণ সময়ে শান্তি ও প্রেমের বাণী নিয়ে আবার এলো সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস ডে। প্রতি বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি এ দিনটির জন্য প্রেমিক-প্রেমিকারা যেমন অপেক্ষায় থাকেন তেমন বিশ্ব জুড়েই এদিনকে বরণ করে নিতে চান অনেকেই। কারণ এই হিংসা, বিদ্বেষ ও সন্দেহের সময়টিতে ভালোবাসার বাণী সবার কাছেই পরম কাঙ্ক্ষিত বিষয়।

পৃথিবী জুড়ে সেন্ট ভ্যালেনটাইনস ডে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় মধ্য আশির দশকে। তবে তা শুরু হয়েছে অনেক বছর আগে। এর ইতিহাস খুজতে গিয়ে অনেক ধরনের কাহিনীর কথা জানা যায়। প্রধান যে কাহিনীটি প্রচলিত আছে তা হলো, রোমান একজন কৃশ্চিয়ান পাদরি বা সেন্ট-এর কাহিনী অনুসারে। তার নাম সেন্ট ভ্যালেনটাইন। তিনি ছিলেন একজন পাদরি এবং একই সঙ্গে চিকিৎসক। কিন্তু সে সময় রোমানদের দেব-দেবী পূজার বিষয়টি ছিল মুখ্য। তারা কৃশ্চিয়ান ধর্মে বিশ্বাসী ছিল না। কৃশ্চিয়ান ধর্ম প্রচারের অভিযোগে ২৭০ খৃষ্টাব্দে রোমের সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস-এর আদেশে ভ্যালেনটাইন-এর মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তিনি যখন জেলে বন্দী ছিলেন তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে ভালোবাসার কথা জানিয়ে জেলের জানালা দিয়ে চিঠি ছুড়ে দিতো। বন্দী অবস্থাতেই জেলার-এর অন্ধ মেয়ের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেন সেন্ট ভ্যালেনটাইন চিকিৎসা করে। মেয়েটির সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে। মৃত্যুর আগে মেয়েটিকে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানান – *ফ্রম ইওর ভ্যালেনটাইন।*

অনেকের মতে, সেন্ট ভ্যালেনটাইনের নাম অনুসারেই পোপ প্রথম জুলিয়াস ৪৯৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ ফেব্রুয়ারিকে সেন্ট *ভ্যালেনটাইনস ডে* হিসেবে ঘোষণা করেন।

আরো একজন ভ্যালেনটাইনের নাম পাওয়া যায় ইতিহাসে। যুবকদের বিয়ে করতে রোমান সম্রাট ক্লডিয়াস নিষেধ করেন যুদ্ধের জন্য ভালো সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই ভ্যালেনটাইন নিয়ম ভেঙে প্রেম করেন। তারপর আইন ভেঙে বিয়ে করেন। ফলে তার মৃত্যুদণ্ড হয়।

এরও বহু বছর আগে থেকে রোমানদের দুটি প্রথা চালু ছিল প্রেম-বিয়ে এবং সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা বিষয়ে উৎসবের জন্য। লুপারকালিয়া এসব উৎসবের অন্যতম। রোম শহরকে দেবতা লুপারকাস রক্ষা করতেন নেকড়ের আক্রমণ থেকে। অনুষ্ঠানের দিন তরুণরা প্রায় নগ্ন হয়েই দৌড়াদৌড়ি করতো এবং নববিবাহিতাকে তাদের চাবুক দিয়ে পেটাতো। তরুণীরা মনে করতো, এতে সন্তান উৎপাদন সহজ হবে। কেননা এটি ছিল সন্তান উৎপাদনের উৎসব। ১৫ ফেব্রুয়ারি এটি হতো। এর আগের দিন ১৪ ফেব্রুয়ারি তরুণ-তরুণীরা নাচের পার্টনার লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত করতো। ৪০০ খৃষ্টাব্দ থেকে দুই দিনের উৎসবের সময় কমিয়ে একদিন ১৪ ফেব্রুয়ারিতে পালন করা হয়। অনেকে মনে করতো, ১৪ ফেব্রুয়ারি পাখিরা পার্টনার বেছে নেয়। ফলে এদিনটি নিবেদনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

এদিনটি পালনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, রোমানরা বক্সের ভেতর নাম রেখে লটারি করে তাদের প্রিয়তম বা প্রিয়তমাকে বেছে নিতো। ১৭০০ সালের দিকে ইংরেজ রমণীরা কাগজে তাদের পরিচিত পুরুষদের নাম লিখে পানিতে ছুড়ে মারতো কাদা মাটিতে মিশিয়ে। যার নাম প্রথমে ভেসে উঠতো সেই হতো প্রকৃত প্রেমিক। ষোড়শ শতাব্দী থেকে কাগজের কার্ড বিনিময় শুরু হয়। ১৮০০ সাল থেকে তামার প্লেটে একই ডিজাইনের অনেক কার্ড ছাপা হয়।

এসব ঘটনাকে সামনে রেখেই বিশ্ব জুড়ে সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস ডে পালিত হয়। বিশ্ব জুড়ে সরবরাহ করা হচ্ছে অসংখ্য কার্ড, ফুল, চকলেট ও নানান উপহার সামগ্রী। দিন দিন এর ব্যাপ্তি বেড়েই চলেছে।

বাংলাদেশে এদিনটির অবস্থান একটু ভিন্ন। এখানে সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস ডে পালিত হয় **ভালোবাসা দিবস** হিসেবে। এখানে আরো যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, বিশ্ব জুড়ে মূলত প্রেমিক–প্রেমিকারা অথবা স্বামী–স্ত্রীরা সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস ডে পালন করলেও বাংলাদেশে ভালোবাসা দিবস শুধু প্রেমিক–প্রেমিকাতে সীমাবদ্ধ না থেকে তা ছড়িয়ে পড়েছে বাবা–মা, ভাই–বোন, সন্তান, বন্ধু, আত্মীয়, অনাত্মীয়, প্রিয় ব্যক্তিত্ব, এমনকি পোষা প্রাণী থেকে শুরু করে গাছপালার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে। তাই এদিনের পালন বাংলাদেশে ব্যাপক।

বাংলাদেশে ভালোবাসা দিবসের প্রচলন, প্রচার ও প্রসার ঘটায় যায়যায়দিন। ১৯৯৩ সালে প্রথমবারের মতো যায়যায়দিন একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের মাধ্যমে এ দেশের মানুষের সামনে একটি নতুন দিনকে উপস্থাপন করে।

যায়যায়দিন প্রথমবারের মতো পাঠকদের কাছ থেকে ভালোবাসা বিষয়ক লেখা আহ্বান করে ২৬ জানুয়ারি ১৯৯৩। মজার বিষয় হচ্ছে, একই বছর ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে টাইম ম্যাগাজিন ভ্যালেনটাইনস ডে–র ওপর প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করে। তবে তারা আগে এ বিষয়ে কোনো ঘোষণা দেয়নি। যায়যায়দিনের পাঠকরা গর্ব করতে পারেন তাদের প্রিয় পত্রিকাকে নিয়ে। ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে আছি সবার চেয়ে!

এটি খুবই আনন্দের বিষয় যে, মাত্র ৩২ পৃষ্ঠার একটি পত্রিকায় যে দিবসের যাত্রা শুরু হয় তা আজ দেশের সকল মিডিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, ভালোবাসা দিবসকে এ দেশের মানুষ আন্তরিকভাবে একান্তই নিজের একটি দিন হিসেবে নিয়েছে। যায়যায়দিনের আনন্দ ও প্রাপ্তি এখানেই। একদিন যা ছিল যায়যায়দিনের নিজস্ব প্রচেষ্টা তা আজ পরিণত হয়েছে সারা দেশের মানুষের প্রিয় বিষয়ে।

**- যাযাদি**

## ভালোবাসা দিবস : যা করবেন

১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসটি অবশ্যই অন্যসব দিন থেকে আলাদা। তাই যতোটা ভালোভাবে সম্ভব সেভাবে এ দিনটি পালন করার চেষ্টা করুন।

## ভালোবাসা দিনে যা করতে পারেন :

♥ নিজের সেরা পোশাকটি বেছে নিন। সেটা দামি কি না তা নিয়ে ভাববেন না। কিন্তু পোশাকটি যেন পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হয়।

♥ প্রিয় মানুষটির জন্য দিনটির একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে রাখুন, যা শুধু আপনাদের দুজনের জন্যই। নির্ধারিত সময়ের আগেই পৌছে যান নির্দিষ্ট জায়গায়। অপেক্ষা করুন। ভালোবাসা দিনে অপেক্ষার মাঝেও আনন্দ খুজে পাবেন।

♥ ভালোবাসার দিনে অনেক ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেসব অনুষ্ঠানে আপনার প্রিয়জনকে নিয়ে যোগ দিতে পারেন।

♥ ভালোবাসা দিনে যার যার সামর্থ অনুসারে প্রিয়জনকে উপহার দিন। প্রিয়জনটি শুধু আপনার প্রেমিক বা প্রেমিকাই নয়। আপনার বাবা, মা, ভাই, বোন, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুসহ সবাইকে উপহার দিতে পারেন।

♥ উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে আপনার বাজেট কতো তা আগে ঠিক করে নিন। যাদের বাজেট একশ টাকা তারা বইমেলা থেকে প্রিয় লেখকের বই বা সিডি, অডিও ক্যাসেট কিংবা ফুল এবং কিছু ভালো চকোলেট, হলমার্ক বা আর্চিস কিংবা অন্য কোনো কম্পানির ভ্যালেনটাইন কার্ড বা ছোট শো-পিস অথবা ছোট ডায়রি বেছে নিতে পারেন।

♥ যাযাদির ভালোবাসা সংখ্যাটিকে প্রথম পছন্দ হিসেবে রাখতে পারেন।

♥ যাদের বাজেট এক হাজার টাকা তারা বেশ কিছু ভালো চকোলেট উপহার দিতে পারেন। ফুল, কার্ড, বই ছাড়াও ভালো পারফিউম, ওডি কলোন বা আফটারশেভ লোশন অথবা ভালো কলম এবং সুন্দর কাগজ উপহার দিতে পারেন। কেউ কেউ শার্ট, পাঞ্জাবি, পাজামা, টাই, স্কার্ফ বেছে নিতে পারেন।

♥ যাদের বাজেট আরো বেশি তারা প্রিয়জনকে উপহার দিতে পারেন প্রিয় মডেলের গাড়ি কিংবা একটি ফ্ল্যাট বা ডায়মন্ড রিং অথবা দুজনে মিলে দেশের বাইরে থেকে ঘুরে আসার দুটো এয়ারলাইন টিকেট।

♥ বাজেট পাচ টাকা থেকে পঞ্চাশ লাখ যাই হোক না কেন, যে উপহারটি দিতে ভুলবেন না তা হলো গোলাপ। প্রিয়জনের হাতে গোলাপ তুলে দেয়ার আনন্দই আলাদা। আর যদি সঙ্গে নিখরচায় একটি নিষ্পাপ চুমু দিতে পারেন তাহলে ভালোবাসা দিনটি আপনার ভালোই যাবে!

## নিদ্রিত নারী

- নির্মলেন্দু গুণ

ঘুমিয়ে পড়েছো? তাই ভালো। ঘুমাও।
তোমাকে আর জাগাতে চাই না, নারী।

তুমি ঘুমাও।

এই শৈত্যতাড়িত রাতে
কোল্ড স্ট্রোকে যদি রক্তক্ষরণে মরি –
দুঃখ নেই, হাসি মুখে দেবো প্রাণ
শীতের রজ্জুতে।

তবু তোমাকে জাগাবো না, নারী।
তোমার দেহের উষ্ণতা মন্থন করে
আমি বানাবো না বিদ্যুৎ।

নারী, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো। ঘুমাও।
এ যে কী পরম সৌভাগ্য আমার!
তোমার নিদ্রিত মূর্তি রঁদার ভাস্কর্যের মতো
কী অপূর্ব তুলনাবিহীন।

এই মরণ শীতের হিমদংশনে
তুমি অহল্যা পাথর হয়ে থাকো।

## অভিশাপ

– মনসুর আলম

ভালোবাসা এবং সুখ পরস্পর বন্ধু।

একদিন সুখকে ভালোবাসা বললো, জানিস, আমি আছি বলেই পৃথিবীতে তোর দাম আছে।

সুখ মুচকি হেসে বললো, না, তোকে দিয়ে আমাকে পায় বলে মানুষ তোর কাছে যায়। সে হিসেবে আমার দাম বেশি।

ভালোবাসা বললো, বেশ তাহলে চল, দুঃখকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি কার দাম বেশি।

সুখ বললো, চল।

তারা দুজনে দুঃখের কাছে গেল। দুঃখ মন খারাপ করে বসেছিল। সুখ আর ভালোবাসাকে আসতে দেখে চেহারাটা আরো কালো করে ফেললো।

সুখ বললো, দুঃখ বলো তো পৃথিবীতে কার দাম বেশি, আমার না ভালোবাসার?

দুঃখ ভাবলো, এই তো সুযোগ নিজেকে বড় করার। একে তো তাদের জন্য মানুষ আমাকে দেখতে পারে না। আমার কাছ থেকে দূরে থাকতে চায়। এখন তাদেরকে বড় বললে তারাও আমাকে ঘৃণা

করবে। তাই দুঃখ ভেবে–চিন্তে বললো, আসলে আমার জন্যই তোদের মূল্যায়ন করে মানুষ। মানুষকে আমি কষ্ট দিই বলে মানুষ তোদের কাছে ফিরে যায়। সে হিসেবে আমার দাম বেশি।
তারা কেউ কারো কথা মানতে রাজি হলো না। সবাই ঠিক করলো ঐশ্বর্যের কাছে যাবে।
সুখ বললো, চলো। তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি। শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে তার চলাফেরা। তার কাছে আমরা নিশ্চয় সমাধান পাবো।
ঐশ্বর্য সব শুনে বললো, তোরা সবাই বোকা। আমাকে ছাড়া তোদের আবার দাম কি রে! ওই দুঃখ বেটা, মানুষ তোকে ঘৃণা করে কেন?
দুঃখ হাত জোড় করে বললো, স্যার, আমি শূন্য, মানুষকে কেবল কষ্ট দিই। আমি অন্ধকার। তাই আমার কাছে মানুষ আসতে চায় না।
ঐশ্বর্য বললো, আর তার বিপরীত আমি। কি রে সুখ, তুই আবার বড় হলি কবে? তোর সব উপকরণ আমিই তো জোগান দিই।

সুখ আর দুঃখ দুজনেই জড়সড়ো হয়ে গেল ভয়ে।

কিন্তু ভালোবাসা সেই সময় নীরবে মাথা উচু করে বসে ছিল।

ঐশ্বর্য বললো, তা ভালোবাসা সাহেব, আপনার তো অনেক দিন আগে যবনিকা ঘটেছিল। এখন যে প্রদীপের মতো একটু একটু প্রাণ আছে তাতেই ঢের। মাথায় উঠতে চাইছেন কেন?
ভালোবাসা বললো, ভুল বললেন। আমার কখনো মৃত্যু হয়নি, হবেও না। যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে বেচে থাকবো।
আরে রাখেন মিয়া, মানুষের মনে বেচে থাকবেন! সেই শিরি–ফরহাদ আর দেবদাস–পার্বতীর সময় নেই। চলে গেছে অনেক আগে। এখন মানুষ ভালোবাসতে গেলেও পয়সা লাগে। প্রেমিকাকে ফুল দেবেন? পাচ টাকা থেকে আজকের দিনে বিশ পচিশ টাকা পর্যন্ত। সেই সঙ্গে বার্থডে গিফট তো আছেই। পহেলা জানুয়ারিতে চায়নিজ খাওয়াতে হবে। ভ্যালেনটাইনস ডে–র একটি কার্ড দুইশ থেকে তিনশ টাকা। সেই সঙ্গে চকলেট তো আছেই। পহেলা বৈশাখ, পহেলা বসন্ত। তাছাড়া ডেটিং, চায়নিজ কতো কি! এসব কি টাকা ছাড়া হয়? তাছাড়া কতো প্রেম হাওয়া হয়ে যাচ্ছে ক্যাম্পাসেই। প্রেমিক–প্রেমিকার বাবাদের যদি আর্থিক অসঙ্গতি থাকে তো আর কথাই নেই, ভালোবাসা পার্কেই শেষ। শেষ পর্যন্ত যে কয়টা ভালোবাসা সফল হয়, দেখা যায় বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সংসার কুপোকাত।
ভালোবাসা আপত্তি করে উঠলো। বললো, আমি মহৎ, নিষ্পাপ, পবিত্র। মানুষের মনে আমার বসবাস। আমাকে পেতে কোনো কার্ড লাগে না, ফুল লাগে না। যে আমার দিকে হাত বাড়ায় তারই হয়ে যাই।
তবে রে শালা... । বলে তেড়ে গেল ভালোবাসার দিকে ঐশ্বর্য।
ঐশ্বর্য ছিল ক্ষমতাবান, শক্তিশালী, বলিষ্ঠ।
আর ভালোবাসা ছিল কোমল, দুর্বল, অসহায়।

ভালোবাসা পেরে উঠলো না।
এক সময় ঐশ্বর্যের হাতে ভালোবাসার মৃত্যু ঘটলো।
ভালোবাসা মৃত্যুর আগে বললো, ঐশ্বর্য, তোমাকে অভিশাপ দিলাম, আজ থেকে তুমি তোমার সর্বশক্তি দিয়ে আমাকে তুমি খুজবে। কিন্তু পাবে না, কোনোদিনও না।

mansuralam909@hotmail.com

# বেহুলা

– নাছির উদ্দিন কাজল

একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছিলাম। সুযোগ সুবিধা ভালোই বলা যায়। তাছাড়া পোশাকে আশাকে কিউট বলে বসদের স্নেহধন্য হয়ে আছি।
মফস্বল শহরের বাড়িতে বাবা মা থাকেন। একমাত্র সন্তান বলে সেখানেও স্নেহের কমতি নেই। গত কয়েক মাস যাবৎ বাবা অসুস্থ। তাই প্রতি মাসেই বাড়ি যেতে হয়।
বাবা বলেন, অসুখ হয়ে ভালোই হয়েছে। প্রতি মাসে তোকে দেখতে পাই। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় তো প্রতি মাসে বাড়ি আসতি না।
গত দুই মাস আগে টেলিফোন পেয়ে দ্রুত বাড়ি যাই। ঘরে ঢুকে বাবার শিয়রে বসে কুশলাদির পর বাবা শোয়া থেকে উঠে বসলেন এবং বালিশের নিচ থেকে একখানা ছবি বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, বাবারে, হায়াত–মউত আল্লার হাতে। আমি এই আছি, এই নেই। কখন কি হয় বলা যায় না। তাই তোর বিয়ে ঠিক করেছি। তাছাড়া এতো সুন্দর মেয়ে জীবনে দেখিনি। তোর সঙ্গে এই মেয়ে খুব সুন্দর মানাবে।
বাবার কথা মতো তাকিয়ে দেখি একেবারে সত্যি। কম দামি চেকের একটা লাল শাড়ি পরা। মনে হয় কোনো নাচের অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি। এতো রূপ যেন শাড়িতে ঢাকা যাচ্ছে না। রূপে সারা অঙ্গ টইটম্বুর–টলমল।
আমি অন্যদিকে ফিরে বললাম, বাবা, হাতে কোনো টাকা পয়সা নেই। তাছাড়া আপনার চিকিৎসা চলছে। অনেক টাকা দরকার।
বাবা বললেন, আমার চিকিৎসা লাগবে না। এই মেয়ে আমার ঘরে এলে আমার অসুখ এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে। তাছাড়া আমি মরে গেলেও শান্তি পাবো। এতো লক্ষ্মী বৌ এ দেশে কারো ঘরে নেই।
ছবিটা বাবার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ভেতরে চলে যাই। গোসল ও খাওয়া–দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ি। বিকেলে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পথে দেখি বাবা রিকশায় বাড়ি ফিরছেন। সঙ্গে আবদুল্লাহ। আমাকে দেখে বাবা বাড়ির ভেতরে আসতে ইশারা করলেন। বাড়ি ফিরে এলাম।
খাটের ওপর বসে বাবা বললেন, আংটি পরিয়ে এলাম। কাল বিয়ে।
মা অবাক হয়ে বললেন, তোমার সব কাজে বাড়াবাড়ি।

মাকে ধমক দিয়ে বাবা বললেন, তুমি চুপ করো। বৌ দেখার আগে কোনো কথা বলবে না।
পরদিন পাঞ্জাবি–পায়জামা পরে এবং কনিষ্ঠ আঙুলটা মেহেদিতে মুড়িয়ে দশ বারোজন লোক নিয়ে রওনা দিই বিয়ে করার জন্য। নদীর পাড়ে এসে রিকশা বিদায় দিয়ে নৌকায় নদী পার হলাম। খেয়াখাটের ইমিগ্রেশন পেরিয়ে দেখি প্রত্যন্ত গ্রাম। কতো বছর পর যে এলাম মনে নেই।
দিগন্ত বিস্তৃত ধান ক্ষেতের মাঝ দিয়ে দূর্বাদলে ঢাকা একটি সরু পথ। বিয়ে করতে যাচ্ছি। তাই কোনো ক্লান্তি নেই। কতোগুলো মাঠ পেরিয়ে চিকন রাস্তার মাথায় একা একটা বাড়ি। চার পাশে ধান ক্ষেত সবুজে সবুজময়। বাড়িটা নতুন। গাছে প্রচুর ডাব। তবে গাছগুলো ছোট। চওড়া দরজায় নতুন একটা কাছারি আর একটা পাকা ঘাটলা। ভেতরে টিনশেড, টিনের বেড়া এবং পাকা মেঝের একটা পরিপাটি ঘর। যেন ছবি। পাশে আরো দুটি ঘর। সম্ভবত গরুর ঘর, গোয়ালঘর।
আবদুল্লাহর দৌড়াদৌড়ি আর হুলস্থূলে বিয়ে শেষ হলো। তবুও রাত নয়টা। আজ রাত বর আর তার দুই চারজন বন্ধু–বান্ধব থাকবে। আবদুল্লাহ বললো, ভয় কইরেন না। দরকার হয় আমি থাকবো আপনার খাটের নিচে।
রাত এগারোটায় বাসরঘরে দেয়া হলো। এতো চটপটে আমি, অথচ ভয়ে কেমন যেন ভেদা মাছ হয়ে গেলাম। মুখ থেকে কথা বের হয় না। তবুও সাহস করে ঘোমটাটা তুলতেই সব ভয় কেটে গেল। যেন অন্য এক আমি, অন্য এক জন্ম, অন্য গ্রহের অন্য এক চাদ যার আলোতে সারা ঘর আলোকিত। শাদা শাদা দুটো হাত হাতে নিয়েই যেন রাত কাটিয়ে দেয়া যায়।
বিমোহিত আমাকে আমি খুজে পাই সকাল নয়টায়। তাও অপরূপ এক রূপের জাগানিয়াতে ভেজা চুলের গোলাপ আর হাতের রজনীগন্ধা দেখে খাটিয়ায় বসে পড়ি। ইচ্ছা হয় আবার জিজ্ঞাসা করি, এই! তুমি এতো সুন্দর কেন?
বিকেলে শার্ট প্যান্ট এবং গলায় টাই পরে বৌকে নিয়ে একবার বাড়ির দরজায় আসি। নতুন শাড়ি গয়না পরা বৌ, যেন এখনই শুটিং হবে। সেট সাজানো হয়েছে, নায়ক নায়িকা এসেছে।
বললাম, বৌ, ওই যে দূরে গাছ দেখা যায় সেখানে কি?
বৌ বললো, এটা নদীর পাড়ের গাছ। নদীর ওপারে বড় একটা অশ্বথ গাছ আছে। তার পাশে ছোট্ট একটা বাজার।
সুন্দর?
সুন্দর।
তারপর বললো, জানেন, আমার বাবা একজন কবিয়াল। বাবা খুব সুন্দর পুথি পড়তে জানেন। ওই যে অশ্বথ গাছটা, তার শিকড়ে বসে রাতে বাবা বেহুলা–লক্ষিন্দরের পুথি পড়তো। অনেক লোকে শুনতো। আর বাড়ি এসে ঘুমন্ত আমাকে দেখে বলতেন বেচে থাকলে আমি নাকি বেহুলার মতো সুন্দরী হবো। লক্ষিন্দরের মতো বর দেখে আমার বিয়ে দেবেন।
এখন পড়ে না?
না। আমি বড় হওয়ায় মা আর পড়তে দেননি। মাকে বাবা খুব ভালোবাসেন তো, তাই মায়ের কথা অমান্য করেন না।
বাবা আর কি করেন?

কৃকেট খেলা দেখেন। বাবার প্রিয় খেলোয়াড় জয়সুরিয়া। যেদিন জয়সুরিয়ার খেলা থাকে সেদিন বাবার ক্ষেতের সব কাজ বন্ধ। আমাদের ঘরে যে টেলিভিশনটা এটা আটাশ ইঞ্চি, বাবা জমি বিক্রি করে কিনেছেন। ব্যাটারি দিয়ে চালান।

এভাবে কয়দিন কেটে যায়। আমার শ্বশুর লাজুক স্বভাবের। আমাকে এড়িয়ে চলেন। তবে শাশুড়ি তার উল্টো। সারাক্ষণ অপেক্ষায় থাকেন আমি কি চাই। কিছু চাইলে হুলস্থুল করে ভুল করে ফেলেন। এক পড়শি আমার শাশুড়িকে বলেন, মনের মতো জামাই পেয়ে এখন বেহুশ অবস্থায় আছেন। তাই পরে আসবো।

সপ্তম বিকেলে বৌকে নিয়ে নদীর পাড়ে বেড়াতে যাই। বালিভরা শুকনো নদী। একপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কাচের মতো স্বচ্ছ জল। একমুঠো পানি নিয়ে বৌয়ের গায়ে ছুড়ে মারি। হাসতে থাকে বৌ। তারপর বলি, বৌ, কবিতা শুনবে?

বলুন।

*আমার প্রেম আজ হয়ে গেল ঘাস*

*খেয়ে গেল গরু আর দিয়ে গেল বাশ।*

হাঃ হাঃ হাঃ।

বাড়ি ফিরে এসে দেখি টিভিটা কার্টনে ঢুকিয়ে নাইলনের দড়ি দিয়ে আমার শ্বশুর বাধছেন।

বললাম, বাবা, বাধছেন কেন?

শ্বশুর বললেন, আমি জানি মেয়ের বিয়েতে অনেক কিছু দিতে হয়। কিন্তু আমার তো দেয়ার মতো কিছু নেই। তাই ভাবলাম টিভিটা তোমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো। এ কথা বলে আমার শ্বশুর ভেতরে চলে গেলেন।

আমি দড়ির বাধন খুলতে লাগলাম। ভেতর থেকে আমার বৌ বলছে, কেদো না বাবা, কেদো না। তারা অন্য রকম লোক। তোমার লক্ষ্মিন্দরের মতো। তাদের কোনো কিছু দিতে হবে না।

মারে, তুই কি সত্যি লক্ষ্মিন্দরের মতো স্বামী পেয়েছিস।

শুনলাম ভেজা গলায় আমার বৌ বললো, পেয়েছি বাবা, পেয়েছি। শুধু দোয়া করো, লক্ষ্মিন্দরের মতো যেন কোনো দুর্ঘটনায় ওকে পড়তে না হয়।

*ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে*

## গাছ

– আফিয়া আয়েশা

গাছপালা খুব ভালোবাসি। তাই আব্বাকে বলেছিলাম ছাদের ওপর পাকা বড় টব করে দিতে। আব্বা দিয়েছিলেন। তারপর কাজি পেয়ারার চারা সংগ্রহ করলাম। কিন্তু তখনো টবের মাটিতে সার–টার মেশানো হয়নি বলে চারা দুটো রেডকাউ দুধের বড় কৌটার মধ্য লাগিয়ে রাখলাম। এর মধ্যে হঠাৎ ঢাকা যাওয়ার পরিকল্পনা হলো। মাকে বললাম চারা দুটোতে পানি দিতে। তারপর ঢাকা চলে

গেলাম। দশ বারো দিন ঢাকায় থেকে খুলনায় ফিরলাম। দৌড়ে গেলাম ছাদে চারা দুটোর হাল দেখতে। দেখে আমার চোখে পানি চলে এলো।

একটা চারা ভালোই আছে, অন্যটি একেবারে শুকিয়ে পাতা-টাতা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। মা পানি দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু কৌটার নিচটা একেবারেই ভাঙা থাকায় পানি সব বাইরে চলে গিয়েছে। শিকড়ে তেমন একটা পানি লাগেনি। প্রতিদিন আচ্ছামতো গাছের ওপর পানি ঢাললাম। পরদিন সামান্যতম পরিবর্তনও দেখলাম না। মনটা ভেঙে গেল। বাচাতে পারলাম না। শেষ চেষ্টা হিসেবে একটা বালতিতে পানি দিয়ে তার ভেতর গাছসহ কৌটা ডুবিয়ে রাখলাম। একদিন চলে গেল। দ্বিতীয় দিন দেখি একেবারে উপরের পাতা দুটিতে একটু সজিবতা ফিরে এসেছে। একটু সতেজ লাগছে। তারপর সেই গাছ বেচে উঠলো। নিজের ভেতর কি ভীষণ এক আনন্দ অনুভব করলাম। আল্লাহর অশেষ রহমতে সেবাযত্নের মাধ্যমে একটি গাছকে বাচিয়ে তুললাম।

ছোট চারা বড় টবে লাগালাম। দিনে দিনে বড় হলো। ফুল এলো, পেয়ারা হলো। প্রায় এক কেজি ওজন এক একটা পেয়ারার। রসালো কিন্তু কচকচে আর দারুণ মিষ্টি। আমি তো বটেই, অনেকেই এতো সুন্দর পেয়ারা কোনোদিন খায়নি। সারা গাছ পেয়ারায় ভর্তি। ভারে ডাল সব নুয়ে পড়ে। বাশ দিয়ে, শক্ত লাঠি দিয়ে ঠেশ দিতে হয়। এই পেয়ারা খাওয়ার পর বাইরের পেয়ারা অনেক দিন খাইনি। এক যুগের বেশি সময় ধরে এই গাছের পেয়ারা খাচ্ছি।

কিন্তু এখন সময় বদলে গিয়েছে। গাছের গোড়ার মাটি খুব শক্ত হয়ে গিয়েছে। সারও দেয়া যায় না। টবের ইটও শিকড়ের চাপে ভেঙে গিয়েছে। পানি দিলে টবের ফাটল দিয়ে বাইরে পড়ে যায়। পেয়ারা আজও প্রচুর হয়। তবে আকারে ছোট, তেমন মিষ্টি নয়। বর্ষাকালে গাছগুলো সুন্দর সতেজ হয়ে ওঠে। কিন্তু কড়া রোদ বা শীতে নিস্তেজ হয়ে যায়। কিছুই করতে পারি না। ভীষণ মন খারাপ লাগে। আরো একটা মহাযন্ত্রণা আছে। বাদুড় এসে সমস্ত পেয়ারা চিবিয়ে রেখে চলে যায়। একটু পাকলে তো খেয়েই ফেলে। পলিথিন বা নেট দিয়ে বেধে রেখেও কোনো লাভ হয় না। সব সাবাড়।

এখন সবাই হিসাব কষছে। ছাদের ওপর কয়েকটা টবের ওজন, মাটির ওজন, এতে নাকি বাড়ির ক্ষতি হবে। তারপর পেয়ারা গাছগুলো কেমন মরে যাচ্ছে, পেয়ারাও আর খেতে পারি না। কাজেই শেষ উপায় হচ্ছে গাছগুলো কেটে ফেলা। এগুলো রেখে কি হবে! একটা তো ইতিমধ্যে মা কেটেই ফেলেছেন। গাছগুলো আমিই লাগিয়েছি। অন্য রকম এক মায়া এগুলোর প্রতি। বিশেষ করে এই গাছটির প্রতি যেটাকে বালতির মধ্যে ডুবিয়ে রেখে বাচিয়েছিলাম। মাকে বলি, আমি যখন বাড়ি থাকবো না তখন কেটো।

মাঝে মধ্যে মনে হয় গাছটি যেন আমাকে বলছে, আমাকে তোমরা কেটে ফেলবে, মেরে ফেলবে। কেন? আমি কি করেছি।

কোনো জবাব খুজে পাই না। তবে আশা একেবারে ছাড়িনি। একবার শেষ চেষ্টা করবো অন্তত একটা দুটো গাছ রেখে দেয়ার জন্য। জানি না সফল হবো কি না।

*খুলনা থেকে*

# লোতান নাম্বার ওয়ান

– বাবু

গভীর এক টেনশনে কেটেছে গত সপ্তাহ পুরোটাই। অবৈধভাবে সিঙ্গাপুর আছি বেশ কয়েক বছর। অনেক রিস্ক নিয়ে কঠিন পরিশ্রম করে কিছু টাকা অবশ্য দেশে পাঠিয়েছি আগে। অজানা কারণে কম্পানি দুই মাসের বেতন আটকিয়ে রেখেছে। বৈধ কাগজপত্র নেই। তাই এ কঠিন পরিশ্রমের টাকা না পেয়েও চুপ করে থাকতে হচ্ছে।

বার বার শীলাকে প্রমিজ করেও দেশে আসতে পারছি না। এখানে যারা অবৈধভাবে থাকে তারা দেশে ফেরার সময় বেশ সমস্যা হয়। এর প্রধান কারণ হলো সিঙ্গাপুরের কঠিন, অমানবিক আইন। এখানে অ্যারেস্ট হলে শাস্তি কমপক্ষে এক মাস জেল। চারটি *স্ট্রোক* বা মালয় ভাষায় *লোতান,* বাংলায় হলো *বেত্রাঘাত* আর সর্বোচ্চ ছয় মাস জেল, সঙ্গে ছয়টি স্ট্রোক। লোতান শব্দ শুনলে মানুষ চমকে ওঠে। ভাবতে অবাক লাগে, এতো সব সমস্যার পরও হাজার হাজার স্মার্ট শিক্ষিত ছেলেরা এখানে অবৈধভাবে আসছে, কাজ করছে।

সিঙ্গাপুরের আইন হলো পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম কঠিন আইন এবং এখানকার পুলিশ হলো অন্যতম দক্ষ পুলিশ। পুলিশের নাম শুনলে ভয় পায় না এমন লোক নেই। কারণ তারা দুর্নীতি বোঝে না, তারা ঘুস খায় না। এখানে অবৈধ বাংলাদেশিরা সাধারণত বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে। বাসার ব্যবস্থা করতে না পারলে কেউ পরিত্যক্ত বিল্ডিংয়ে লুকিয়ে থাকে। কেউ রাতের বেলায় জঙ্গলে থাকে অথবা পার্কে কিংবা বড় বড় ওভারব্রিজের নিচে থাকে।

এ দেশের পুলিশ, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ প্রায়ই অবৈধ ওয়ার্কারদের ধরার জন্য রেইড দিয়ে থাকে। এখানে এমন ঘটনা বহু ঘটেছে পুলিশের রেইড থেকে, লোতান থেকে বাচার জন্য চার তলা, পাচ তলা বিল্ডিং থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে পালাতে গিয়ে মারা গেছে বেশ কয়েকজন। অনেকে পালাতে গিয়ে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে। বেশির ভাগ অবৈধ শ্রমিকরা দেশে যায় টুরিস্ট পাসপোর্ট কিনে পাসপোর্টের ছবি পরিবর্তন করে প্রচলিত ভাষায় যাকে *পিসি* বলা হয়। বাংলাদেশ থেকে ভ্রমণ ভিসায় এখন সিঙ্গাপুর আসা বেশ কঠিন হয়ে গেছে। খুব কম লোকই আসতে পারছে। তাই পাসপোর্টের দাম বেড়ে গেছে।

আমার কাছে সর্বসাকুল্যে যা আছে তা পুরোটাই লেগে যাবে পাসপোর্ট কিনতে। বেশ ভাবনায় পড়ে গেলাম। দীর্ঘ দিন পর দেশে যাচ্ছি, শীলার জন্য কোনো গিফট নিয়ে যাবো না, শীলাকে খুশি করবো না, এ কি করে সম্ভব? আমিই বা কিভাবে তাকে গিফট দেয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হই। তাই আমার জন্য দেশে আসার বিকল্প যে ভয়ংকর পথটা বাকি আছে সেটাই বেছে নিতে হচ্ছে। অর্থাৎ সিঙ্গাপুরের পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করার ডেঞ্জারাস সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।

ছাত্র জীবনে শরৎচন্দ্রের একেকটা উপন্যাস আমি কয়েকবার করে পড়েছি। বিশেষ করে উপন্যাসের স্যাক্রিফাইসিং চরিত্রগুলো আমার খুবই প্রিয় ছিল। *ত্যাগই প্রকৃত আনন্দ* এ রকম একটা মানসিকতায় আমিও গড়ে উঠেছিলাম। তাই টাকাগুলো বাচানোর জন্য বা শীলাকে গিফট দেয়ার জন্য প্রয়োজন

বোধে জেল খাটবো, স্ট্রোক বা লোতান খাবো। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। যদিও এটা হবে জেনেশুনে গোখরো সাপের লেজে পা রাখার মতোই ভয়ানক বিপজ্জনক।

সারা রাত টেনশনে ঘুমাইনি। রমজান মাস। সেহরি খেয়ে ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমুতে গেলাম। সকাল নয়টায় ঘুম থেকে উঠে দেরি না করে ব্যাগে কিছু কাপড়–চোপড় ভরে খোচা খোচা দাড়ি, উসকো–খুসকো চুল এমন চেহারায় ব্যাগটা কাধে ঝুলিয়ে কাউকে কিছু না বলে বাসা থেকে বেরিয়ে গেলাম। টোপাও থেকে বাসে চড়ে বাংলাদেশিদের প্রিয় *মোস্তফা প্লাজা*–র আশপাশে বেশ কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরলাম। মন খুব খারাপ। চাচ্ছিলাম রাস্তায় পুলিশ সন্দেহভাজন অবৈধ শ্রমিক হিসেবে ধরে নিয়ে যাক। বেশ কয়েকটা টহল পুলিশের গাড়ি আমাকে ক্রস করে চলে গেল। আমাকে না ধরায় বিরক্ত হলাম এবং অনেকক্ষণ রোযা রেখে রোদে ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম।

*পাছির পানজাংয়ে* আমার এক বন্ধু থাকে, ট্যাকসি নিয়ে সোজা ওখানে চলে গেলাম। এক পা, দুই পা করে রাস্তার এক পাশ দিয়ে তার বাসার দিকে হাটছি এমন সময় চোখে পড়লো পাশেই পুলিশ স্টেশন। পুলিশ স্টেশনের সামনে এসে দাড়িয়ে গেলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম, স্পষ্ট করে লেখা আছে *পাছির পানজাং পুলিশ পোস্ট, সিঙ্গাপুর।* আরো খেয়াল করলাম, ছোট এ পুলিশ পোস্টে মাত্র একজন অফিসার অনেকটা রিলাক্সড মুডে বসে আছে এবং সে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আল্লাহকে আরেকবার স্মরণ করে গেট খুলে সরাসরি পুলিশের সামনে গিয়ে গুড আফটারনুন বলে অফিসারকে উইশ করলাম।

অফিসার সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে বললো, ইয়েস, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ? সিট ডাউন প্লিজ।

তারপর ইংরেজিতে অফিসারকে যা বললাম তা হলো, আমি একজন বাংলাদেশি। আমার কোনো পাসপোর্ট নেই, ওয়ার্ক পারমিটও নেই বা বৈধ কোনো কাগজপত্রও নেই। কয়েকজন মালয়শিয়ান এজেন্ট আমাকে মালয়শিয়া থেকে অবৈধভাবে সিঙ্গাপুর পাঠিয়েছে। সিঙ্গাপুর এনে ওরা আমাকে ভালো কাজের ব্যবস্থা করে দেবে এ শর্তে তাদেরকে এক হাজার ডলার দিয়েছি। কিন্তু সিঙ্গাপুর এসে তাদের খুজে পাচ্ছি না। অর্থাৎ তাদের দ্বারা আমি প্রতারিত হয়েছি। আমার কাছে যে টাকাগুলো ছিল তা সিঙ্গাপুরে নয়দিন মাত্র থেকেই শেষ হয়ে গেছে। এখন কি খাবো বা কোথায় থাকবো জানি না। তাই দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিন। খুব অসহায় বোধ করছি।

অফিসার আমার কথাগুলো খুব মনোযোগসহ শুনলেন। যদিও শাস্তি কম হওয়ার আশায় কিছু মিথ্যা বলেছি তবুও অফিসার আমার কথাগুলো বিশ্বাস করেছে। অমায়িক ভদ্র ওই পুলিশ অফিসার আমাকে অপেক্ষা করতে বলে ওনার উপরের অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। দশ মিনিট অপেক্ষা করলাম। পরক্ষণেই টহল পুলিশের গাড়ি নিয়ে দুইজন পুলিশ এসে আমাকে অন্য একটি রুমে নিয়ে আমার সব কিছু চেক করে আমার দুই হাত পেছনে নিয়ে হাতকড়া লাগিয়ে পুলিশের গাড়িতে ওঠালো। এর মধ্যে ভয় না পাওয়ার জন্য কমপক্ষে দশবার বলেছে, সিঙ্গাপুরের পুলিশ কাউকে পেটায় না এও জানিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর পুলিশের গাড়ি এসে থামলো থানায়। থানায় কয়েকজন পুলিশ অফিসার ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের পর আমাকে একটা পৃজন সেলের মধ্যে আটকিয়ে রাখা হলো।

সন্ধ্যা সাতটার দিকে আমাকে কিছু খাবার দেয়া হলো। ইফতার শেষে ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়লাম। মহিলা পুলিশের ডাকে ঘুম ভাঙলো। আমাকে নিয়ে আবার হাতকড়া লাগিয়ে গাড়িতে ওঠালো। এবার নিয়ে গেল লেভেন্ডার ইমিগ্রেশনে। এখানে প্রয়োজনীয় চেক করার পর আবারও ইমিগ্রেশন পৃজন সেলে আটকিয়ে রাখা হলো। এ রুমে ঢুকে এবার দেখতে পেলাম বিভিন্ন দেশের বেশ কিছু লোক কেউ ঘুমুচ্ছে, কেউ বসে আছে। বিশাল দেহের একজন এবং অনেক লম্বা একজন এ দুজনকে ঠিক বুঝতে পারলাম না এরা কোন দেশের। পরবর্তী কালে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলাম এরা ইরাকের।

ঘুমানোর কোনো পরিবেশ নেই। বসে থেকেই এক সময় সকাল হলো। আনলাকি থারটিন অর্থাৎ আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ দিন ১৩ নভেম্বর ২০০২–এলো। আনুমানিক সকাল নয়টায় আমাকে এন্টিকরাপশন অফিসার তদন্তের জন্য ওনার অফিসে নিয়ে গেলেন। আমাকে দেখেই তিনি রেগে গিয়ে বললেন, আই ডোন্ট লাইক এনি ব্লাডি ফাকার বাংলাদেশি। আই ডোন্ট লাইক বাংলাদেশ অলসো – ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মি. ফাকার?

জীবনে কেউ কখনো আমাকে এভাবে বলেনি, আমার দেশের বিরুদ্ধে কেউ এভাবে বলেনি। লেখাপড়া শেষ করেও দেশে কোনো চাকরি পাইনি। তাতে কি, তবুও আমার দেশকে ভালোবাসি। আমার দেশে সুস্থভাবে বেচে থাকার কোনো পরিবেশ নেই, দুর্নীতি, চাদাবাজ, সন্ত্রাসে ছেয়ে গেছে বাংলাদেশ। তাতে কি। আমি ভালোবাসি বাংলাদেশকে। তাই অফিসারের কথায় চরম অপমান বোধ করলাম। হাতে হাতকড়া লাগানো। তবুও মনে হলো, অফিসারের মুখে একটা ঘুসি মেরে সবগুলো দাত ফেলে দিই। বুঝে গেলাম সবচেয়ে খারাপ অফিসারের ওপর আমার কেইস পড়েছে। কপালে ভোগান্তি আছে।

দীর্ঘ সাত ঘণ্টা রিমান্ডে নিয়ে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের সময় কমপক্ষে দশবার *বাস্টার্ড* বলে গালি দিল। কেইস লিখে বিকেলে আবার পৃজন সেলে পাঠিয়ে দিল। পরের দিন সকাল ১৪ নভেম্বরে আমাকে কোর্টে ওঠানো হলো। জজ আমার শাস্তি রায় পড়ে শোনালো। অবৈধভাবে সিঙ্গাপুরে আসার জন্য একমাস জেল এবং চারটি লোতান।

কোর্ট থেকে কয়েদিদের গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো সিঙ্গাপুর কুইনসটাউন পৃজন সেলে। বিভিন্ন দেশের পঞ্চাশজন কয়েদিকে এক গাড়িতে নেয়া হলো। লাইন ধরে সবাইকে দাড় করানো হলো। অফিসাররা কুকুর দিয়ে এবং নিজেরা চেক করার পর সবাইকে নিজের কাপড় খোলার নির্দেশ দেয়া হলো। পঞ্চাশজনকে দশজন করে পাচটা লাইন করে উলঙ্গ করা হলো। লজ্জায় চোখ–মুখ লাল হয়ে গেল। উলঙ্গ অবস্থায় পাচ মিনিট এক্সারসাইজ করানো হলো।

এতোগুলো মানুষ এক সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে ব্যায়াম করার বিরল দৃশ্য জীবনে প্রথম দেখলাম। তারপর সবাইকে একটা করে নেভি ব্লু হাফ প্যান্ট ও শাদা টি–শার্ট পরতে দেয়া হলো। এটাই হলো সিঙ্গাপুরে কয়েদিদের ড্রেস। তারপর টাকা–পয়সা এবং ব্যাগ জমা রেখে হাতের মধ্যে কয়েদি স্টিকার লাগিয়ে খুব ছোট আকারের একটি রুমে থাকতে দেয়া হলো। প্রতি রুমে চারজন করে। আমার সঙ্গে ছিল ইরাকের ইব্রাহিম ও জামাল এবং একজন মুসলিম সিঙ্গাপুরিয়ান। দুদিন এখানে রাখার পর আবার পাঠিয়ে দিল পোস্টডাউন পৃজন সেলে।

সিঙ্গাপুরে পোস্টডাউন পৃজনের খাবার সবচেয়ে খারাপ। সকালবেলা চার পিস রুটি, এক মগ কফি, দুপুরে ভাত ও তাহু এবং বিকেলে ভাত–মাছ। *তাহু* হলো এক ধরনের মালয়শিয়ান খাবার যা কোনো বাংলাদেশি খেতে পারে না।

এখানে বড় একটা রুমে মোট ত্রিশজন কয়েদিকে দেয়া হলো। জেলের নিয়ম–কানুন খুবই কড়া। প্রতিদিন জেল কর্তৃপক্ষ দশবার চেক করবে। চেক করার সময় সুন্দর করে সারিবদ্ধভাবে লাইন ধরে বসে থাকতে হবে। এর মধ্যে অফিসার আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে সমস্বরে বলতে হবে, গুডমর্নিং স্যার অথবা গুড আফটারনুন স্যার। আবার চলে যাবার সময় বলতে হবে থ্যাংক ইউ স্যার।

এভাবেই কেটে গেল চোদ্দ দিন। চোদ্দ দিন পর আমার ডাক এলো। অর্থাৎ আমার শাস্তি লোতান মারার জন্য ডাকা হলো। মোট ষাটজনকে লোতান মারা হবে। আবার কাপড় খোলানো হলো। লোতান মারার জন্য বিশেষ ড্রেস পরানো হলো। যে ড্রেসের নিচ থেকে বুক পর্যন্ত ঢাকা আছে শুধু পাছা বরাবর জায়গাটুকু খোলা আছে। কারণ এ পাছাতেই লোতান বা বেত্রাঘাত করা হবে।

লাইন ধরে একজন করে লোতান রুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর লোতান মারা হচ্ছে। আমার আগে ছিল ইরাকের দুজন। কাচের রুম। তাই দেখা যাচ্ছিল লোতান মারার নির্মম, বর্বর দৃশ্য। আমার আগে বিশাল দেহের অধিকারী ইরাকি ইব্রাহিমকে লোতান মারার জন্য নেয়া হলো। লোতান দেয়ার সময় সে চিৎকার করে রুম ফাটিয়ে ফেলছিল। খুব রাগ হচ্ছিল তার ওপর। কারণ এতোক্ষণ যাও সাহস ছিল তার চিৎকারে ভয়ে কাপতে থাকলাম।

অবশেষে আমার পালা। দুজন আমাকে ধরে ভেতরে নিয়ে গেল। দু পা বাধা হলো, হাত বাধা হলো, মাথা নিচের দিকে নেয়া হলো। মাথার সামনে মাথায় হাত দিয়ে একজন দাড়িয়ে রইলো। আমি প্রাণপণে আল্লাহকে ডাকছি। শুনতে পেলাম অফিসার ঘোষণা করলেন, স্ট্রোক নাম্বার ওয়ান। খুব কাছেই আরেকজন বললো, লোতান নাম্বার ওয়ান। মুহূর্তেই পাছায় প্রচণ্ড জোরে শো করে এক আঘাত।

আঘাতে সম্ভবত আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। পরবর্তী আরো তিনটি লোতান দেয়া হলো। তারপর আবছা আবছা দেখতে পেলাম দুইজন কাধে করে আমাকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে নার্সের কাছে। নার্স ক্ষতস্থানে স্প্রে করে দেয়ার পর জ্ঞান ফিরে পেলাম। দুজন ধরে এনে রুমে পৌছে দিল।

দুই সপ্তাহ পর জেল থেকে মুক্তি পেলাম। ১৭ নভেম্বর সকালে আমাকে স্পেশাল পাস দেয়া হলো। এক কম্পানির অধীনে দুই মাস কাজ করার অনুমতি দেয়া হলো। দুপুর বারোটায় কম্পানির গাড়ি আমাদেরকে আনার জন্য পোস্টডাউন পৃজনের বাইরে অপেক্ষা করছিল।

জেল থেকে বের হওয়ার সময় বললাম, গুডবাই পোস্টডাউন, পৃজন, গুডবাই লোতান নাম্বার ওয়ান। কারণ আমার সামনে অপেক্ষা করছে শীলার ভালোবাসা, শীলাকে সেন্ট ভ্যালেনটাইনস ডে গিফট দিতে পারার আনন্দ, ভালোবাসার প্রকৃত সুখ যে সুখের কোনো তুলনা হয় না।

*পূর্ণ ঠিকানাবিহীন*

*সিঙ্গাপুর থেকে*

# গোলাপী

– মোহাম্মদ আলিপ হোসেন

এই রচনাটিতে কোনো সম্পাদনা করা হয়নি। – *যাযাদি*

আমি লেখাপড়া তেমন জানিনে প্রাইমারী পাশ দিয়ে সবে হাই স্কুলে পড়তাম। আমার সাথে পড়ত আমাদের গ্রামের আমাদের বাড়ীর পাশের গোলাপী। দুজনেই পড়াই ভাল ছিলাম। আমি আর গোলাপী দুজনেই মাঠে ছাগল খাওয়াতে যেতাম। গোলাপী আমাকে মাঠে গিয়ে বলল আয় আমরা একটা খেলা খেলি। আমি কলাম কি খেলা তা পর আমরা সেই খেলা খেললাম। এই খেলা আমাদের মধ্যে অনেক দিন চলল। তার পর শীতের এক রাতে গোলাপী আর আমি ওদের ঘরের পাশে ঐ খেলা খেলছি এমন সময় ওর দাদা এসে আমাকে ধরে ফেলল আমি আর পালাতে পারলাম না। তার পর গ্রামের শালিসে আমাদের বিয়ে হয়। বিয়ে মানে কি তখন আমি বুঝতাম না। এদিকে আব্বা, মা আমার দেখতে পারে না। আমার আর গোলাপীর তারা পেত্তক করে দেয়। আমি পরের বাড়ী কাম করি গোলাপীও সেই বাড়ীর কাম করে। পরের বছরে গোলাপীর পেট হল এবং একটা ছাওয়াল হল। এভাবে আমার অহন ৩ ছাওয়াল ২ মিয়া আমি আর গোলাপীর কথায় ঐ খেলা খেলি না। কারণ ও খালি মিছে কথা কয়? বড় ছাওয়াল ফোরে পড়ে। আমার ছাওয়ালের কই বাজান তুই আমার মত কারো কথা শুনে ঐ খেলা খেলবিনে। গোলাপীর বয়স ৩০ বছর, মনে ৫০ বছর হয়েছে। কিন্তু আমি আবার বিয়ে করতে পারব। তাই আমি সবাইকে বলি আমার মত গোলাপীর যুক্তি শুনে ঐ খোলা খেলবে না। অকালে মরবেন না। আমার কথা হয়তো ছাপা হবে না তবুও লেখলাম যদি ছাপা হয়।

*মাজদিয়া, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ থেকে*

# চা

– আবু সাজেদ ওয়ালীউল্লাহ

ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু নাটকীয়।

১৯৯৬ সাল।

বিয়ে খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে বাসের জন্য অপেক্ষা করছি। হঠাৎ এ সময় দাতে কিছুটা ব্যথা অনুভব করলাম। গোশতটা একটু শক্ত খাওয়ায় দাতের এই করুণ অবস্থা। ভাবলাম, এ মুহূর্তে যদি একটা দিয়াশলাইয়ের শলাকা হাতে পেতাম!

দেখলাম, অল্প কিছুটা দূরে একটা টি স্টল। কাছে গিয়ে কর্মরত ছেলেটিকে বললাম, ভাই, দিয়াশলাইটা একটু দেখি তো?

আমার এ কথা শুনে ছেলেটি একটু মুচকি হেসে দুই আঙুলের মাধ্যমে বিশেষ কায়দায় দিয়াশলাইটি বার কয়েক ঘুরিয়ে বললো, দিয়াশলাই দেখতে চান? দেখেন ভাই দেখেন, ভালো করে দেখেন। এক

পিঠে তিন ঘোড়া, অন্য পিঠ নীল। দেখছেন তো এবার? বলেই দিয়াশলাইটি আমাকে না দিয়ে তা যথাস্থানে রেখে দিল।

বুঝলাম, ইয়ার্কি করা হচ্ছে। ইচ্ছে করছিল, একটা চড় মেরে ওর সব কয়েকটি দাত ফেলে দিই। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে ভেতরে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললাম, এই যে ভাই, একটা চা দেখি তো?

দেখলাম, ছেলেটি ঝটপট একটা চা বানিয়ে আমার সামনে রেখে গেল। গরম চায়ের ধোয়া উড়ছে। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে চা। কিন্তু আমার ভেতরের জমানো রাগ সহজে ঠাণ্ডা হলো না।

আপনার চা তো ঠাণ্ডা হয়ে গেল ভাই? জলদি খেয়ে নেন। ছেলেটি উচ্চস্বরে ডেকে বললো।

প্রশ্ন করলাম, দুধ, চিনি ঠিক মতো দিয়েছো তো?

সবই দিয়েছি। আরে ভাই, আগে টেস্ট করেন। লাগলে মর্জি মতো নিতে পারবেন। কোনো অসুবিধা নাই।

আমি চায়ের কাপটি একাত-ওকাত করে বললাম, সবই ঠিক আছে। তবে লিকারটা একটু বেশি মাত্রায় হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আমার চা দেখা শেষ। আমি চললাম, কেমন? খোদা হাফেজ।

চায়ের বিলটা? ছেলেটি একদম চেচিয়ে ওঠলো।

চা তো খাইনি। বিল দেবো কেন? সহজ কণ্ঠে বললাম।

আমি যেতে উদ্যত। দেখলাম, এ সময় ছেলেটি দৌড়ে গিয়ে তার মালিককে নিয়ে হাপাতে হাপাতে এসে বললো, এ লোকটি, এই লোকটি চায়ের বিল দিচ্ছে না।

দোকানের মালিক বলছে কি হয়েছে ভাই? বাচ্চা মানুষ। কোনো ভুল করেনি তো? আমাকে সব খুলে বলুন।

ইনি চায়ের বিল দিচ্ছেন না। ছেলেটি আবার তার মালিকের কাছে অভিযোগ করলো।

বললাম, চা তো খাইনি। বিল দেবো কেন?

চা খাইলেন না তো বানাতে বললেন কেন? ছেলেটি রাগত স্বরে বললো।

বললাম, উহ! আমি তো তোমাকে চা বানাতে বলিনি। খেতেও চাইনি। শুধু একটা চা দেখতে চেয়েছিলাম। আমার চা দেখা শেষ, ব্যস। তোমার চা তো তোমারই আছে। আমি বিল দেবো কোন কারণে?

ইতিমধ্যে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। পরিবেশ ভারী হয়ে উঠলো। আমি বিস্তারিত বিষয় খুলে বললে ছেলেটির গালে মালিক এক চড় মেরে আচ্ছা মতো বকুনি দিতে থাকেন।

গুরুজনের সঙ্গে বেয়াদবি। মাফ চেয়ে নে। যা মাফ চেয়ে নে বলছি।

দেখলাম, ছেলেটির দুই চোখ জলে ছল ছল করছে। আমার ভেতরে তখন বরফ গলতে শুরু করলো। ক্ষমা চেয়ে কাছে আসতেই তার কাধে হাত রেখে বললাম, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ক্ষমা করে দিয়েছি। বড়দের সম্মান করো, দেখবে সবাই তোমাকে ভালোবাসবে। কেমন?

আমার এ কথা শুনে ছেলেটি হাউমাউ করে কেদে ফেললো এবং আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলো। আমি চায়ের বিল দিলে মালিক তা নিতে আপত্তি জানালো।

চায়ের বিল নয়, ভালোবাসা স্বরূপ ছেলেটির পকেটে তখন জোর করে দশ টাকার একখানা নোট গুজে দিই। ছেলেটি ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো। কেন জানি, নিজেকে তখন অপরাধী মনে হচ্ছিল।

*দক্ষিণ কোরিয়া থেকে*

## লাল গোলাপ

– রোখসানা পারভীন নীপা

সৃষ্টির আদিকালের কথা।

বিধাতার আদেশ অমান্য করায় আদম এবং ইভ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত। পার্থিব জীবনে বিধাতার প্রতিনিধি রূপে তার আদেশগুলো সুষ্ঠুভাবে পালন করলেই তারা আবার স্বর্গে আবাস গড়তে পারবে।

স্বর্গে ইভের একটা নির্দিষ্ট সময় কাটতো স্বর্গোদ্যানে। সেখানকার শ্বেতশুভ্র গোলাপ ছিল তার অতি প্রিয়। গোলাপের মাদকময় সৌরভে বিভোর হয়ে থাকতো ইভ। পৃথিবীতে নির্বাসনে এসে সেই স্বর্গ সৌরভের বিরহে ইভ প্রায়ই বিষণ্ন হয়ে থাকতো।

বিষয়টা আদিবাবাকেও ভাবিয়ে তুললো। যার জন্য স্বর্গ ত্যাগ করতে পেরেছে তার জন্য সে কি না করতে পারে? তাই ইভের বিষণ্নতা সইতে না পেরে আদম স্বর্গের উদ্দেশ্যে রওনা হলো একদিন। কিন্তু স্বর্গের প্রহরীরা কিছুতেই তাকে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করতে দিল না। বিফল মনোরথ হয়ে আদম অদূরে দাড়িয়ে রইলো বিষণ্ন বদনে।

তা দেখে দয়া হলো এক প্রজাপতির। সে জানতে চাইলো বিষণ্নতার কারণ। সব শুনে বললো, একটু অপেক্ষা করো, দেখি আমি কিছু করতে পারি কি না।

প্রজাপতি উড়ে গেল স্বর্গোদ্যানে। বিভিন্ন ফুলের কাছে ঘুরতে লাগলো। কিন্তু কোনো ফুলই তার সৌরভ দিতে চাইলো না। অবশেষে আধফুটন্ত একটি গোলাপ তার সবটুকু সুবাস আদি মানবীর জন্য দিতে রাজি হলো।

প্রজাপতি ফুলের বুক থেকে সুবাস নিতে লাগলো।

হঠাৎ প্রহরারত দেবদূত তা দেখে ফেললো। দেবদূতের তা সহ্য হলো না। অবাধ্য প্রজাপতিকে শাস্তি দেয়ার জন্য দেবদূতের চোখ থেকে আলোকরশ্মি এসে প্রজাপতির বুক বিদীর্ণ করে দিল। প্রজাপতির বুকের রক্তে লাল হয়ে গেল শাদা গোলাপ।

এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে অনুশোচনা হলো কৃতকর্মের জন্য। ফুলসহ গাছটিই সে আদমকে দিয়ে দিল।

সেই থেকে লাল গোলাপ হলো ভালোবাসার প্রথম উপহার আর প্রজাপতি রক্তহীন ও ভালোবাসার প্রতীক।

(বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

*ভাগলপুর, বাজিতপুর থেকে*

# বেনসন অ্যান্ড হেজেস

– এ. এফ কাঞ্চন বাহাদুর

আমরা হয়তো অনেকেই জানি না *বেনসন অ্যান্ড হেজেস* সিগারেটের নামকরণের মূল কাহিনী। এর পেছনে লুকিয়ে আছে যা এটা হচ্ছে একটি সার্থক ভালোবাসার প্রতীক।

সেকালে আমেরিকার চেয়ে ইংল্যান্ড কৃষ্টি–কালচারে উন্নত ছিল। তাই আমেরিকানদের একটু ভিন্ন চোখে দেখতো ইংলিশরা। ওই সময়ে ইংলিশ বংশোদ্ভূত কন্যা বেন আমেরিকার বংশোদ্ভূত ছেলে হেজেস-কে প্রচণ্ড ভালোবাসতো। তারা ঘর বাধার স্বপ্ন দেখতে লাগলো। এতে দুই পরিবার ছিল অসম্মত।

বেন এবং হেজেস বুঝতে পারলো যে, পারিবারিক দ্বন্দ্বই তাদের পরবর্তী জীবন গড়তে বাধার প্রাচীর হয়ে দাড়িয়েছে। তাই তারা দুজন সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের ভালোবাসাকে তারা স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটা কিছু করবে। অনেক ভেবে চিন্তে তারা দুজন আগুনকে বেছে নেয়।

আগুনে ঝাপ দিয়ে দুজন পৃথিবীকে গুডবাই জানায়।

তাদের এ মর্মান্তিক মৃত্যুতে দুই পরিবার ভেঙে পড়ে। এবং দুই পরিবার বেন এবং হেজেস–এর মৃত্যুকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য যৌথভাবে প্রতিষ্ঠা করে বেনসন অ্যান্ড হেজেস। এর পেছনে তাদের যুক্তি ছিল, যে দুজন আগুনে পুড়ে মৃত্যু বেছে নিয়েছে তাদের নামে প্রতিষ্ঠিত সিগারেটও সারা পৃথিবীতে প্রতিটি মুহূর্তে একটি করে হলেও জ্বলবে।

*রায়পুর, লক্ষ্মীপুর থেকে*

# দেবী

– সাদেক আলী

আমার শান্ত নিরিবিলি জীবনে ঝড় তুলে জীবনটাকে এলোমেলো করে যে চলে গেছে তার ধ্যান আজও করে যাচ্ছি। পুনর্জন্মে বিশ্বাস নেই। থাকলে হয়তো নজরুলের মতো করে বলতাম, *মিটিল না সাধ ভালোবাসিয়া তোমায়, বাসিতে ভালো পুনঃ আসিব ধরায়।* তার কথা ভাবতে এখনো আমার ভালো লাগে। মনে হয় যেন এই সেদিনের ঘটনা। জাবর কাটার সঙ্গে আমি পুরনো স্মৃতিগুলো রোমন্থন করি। এখনো তাকে দেখলে সেই আগের মতোই আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, আমি নার্ভাস হয়ে পড়ি।

যখন তার বিয়ের খবর শুনি তখন কষ্ট পাইনি। কারণ জানতাম তাকে পাবো না। শুধু প্রার্থনা করেছিলাম যেন সে তাড়াতাড়ি বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্ত হয়। জীবনে একটি দাগ নিয়ে সে হয়তো আমার দিকে ফিরে তাকাতেও পারে। কিন্তু আমার প্রার্থনা কবুল হয়নি। সে সুখেই ঘর সংসার করতে লাগলো। যখন হাস্যোজ্জ্বল তাকে দেখি স্বামী–সন্তান নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন আমার বুকের ভেতর খচ করে ওঠে।

আহমদ  ছফা কয়েকটি নারী চরিত্র নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। উপন্যাসটির নাম *অর্ধেক নারী, অর্ধেক ঈশ্বরী।* আমার জীবনে সে প্রথম ভালোলাগা, শেষও সেই। অর্ধেক ঈশ্বরী নয়, সে আমার দেবী।

তার নাম চান্দা। তাই বন্ধুরা আমাকে ঠাট্টা করে ডাকতো *চান্দু।* কেউ বা বলতো, কি রে চাদে যাওয়ার মই কতোদূর তৈরি হলো?

আমি কেবল হাসতাম। তারা তো ঠাট্টা করবেই, ওরা তো আমার ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে না। আমার দেবীর আরাধনা করে যাচ্ছি। আজীবন করে যাবো। নজরুল যেমন বলেছিলেন –

*জনম জনম তব তবে কাদিব...*

*তব নাম গাহি, তব প্রেম চাহি, ফিরে ফিরে নিতি*

*তব চরণে আসিব।*

*হালিশহর, চট্টগ্রাম থেকে*

# টিট ফর ট্যাট

আর পারা যাচ্ছে না। বয়সের দোষ বোধ করি। অনেক দিন খেলাধুলা, আড্ডা আর পড়াশোনা নিয়ে কাটানোর পর অবশেষে ইউনিভার্সিটির মধ্য বেলায়।

ভেবে দেখলাম আমার সব কিছুই আছে। অসম্ভব ভালো মা–বাবা, বন্ধুসম ভাইবোন, প্রচণ্ড ভালো কিছু বন্ধু–বান্ধবী প্রমুখ। কিন্তু এতেও মনে হয় *সব হইয়াও হইলো না কিছুই।* কিছু কিছু জিনিস মনে হয় ভালোবাসা, ভালোলাগার মানুষ ছাড়া শেয়ার করা যায় না।

ঠিক বললাম না হয়তো। শেয়ার করা যায়। তবে প্রত্যাশাটা অবশ্যই অন্য সবার থেকে ভালোবাসার মানুষটির কাছে ভিন্ন হয়। তার সমমর্মিতা, সহানুভূতিশীলতা, মমত্ববোধ আমার প্রতি যেমন হবে তেমনটি কি আরো কারোও সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে? আর ওর সঙ্গে যদি যোগ হয় ফাটাফাটি রকমের অভিব্যক্তি? তুলনাবিহীন একেবারে।

সেই জন্য অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম, ভালোলাগা থেকে ভালোবাসার মানুষটিকে খুব দ্রুত খুজে নিতে হবে। যে অবশ্যই হবে আমার আরেকটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো।

নিজের প্রত্যাশার সঙ্গে অনবরত মেলাতে থাকি কোথায় পাবো আমার মানবীটিকে। ছেলে হিসেবে লাজুক ছিলাম না কোনোকালে। অভদ্র কিংবা বেয়াদব আমার শত্রুও বলবে না। নিজের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাটা চর্চা সূত্রেই পেয়েছিলাম ক্যাডেট কলেজে পড়ার সুবাদে। ক্ষেত্রে প্রকাশটা হয়তো কিছুটা রূঢ় হয়ে যেতো। ভেতরের মনটা যতো কোমলই থাক, সুমিষ্ট প্রকাশের ভাবটা অনুপস্থিতির কারণে প্রকাশ ভঙ্গিটাতে কঠোরতা আর শীলতার কিছুটা মিশ্রণ এসে পড়তো। প্রচণ্ড আড্ডাবাজ, ফুর্তিবাজ, চঞ্চল, খেলাপাগল এই আমি।

আমার এসব বৈশিষ্টের জন্যে প্রচুর লোকজনের সঙ্গে মেশার সুযোগ হতো। এতোদিন এগুলো ছিল স্রেফ সময় কাটানো। কিন্তু নিজের প্রয়োজনে প্রচণ্ড সিরিয়াসনেস নিয়ে নিজের ইভকে হন্যে হয়ে

খুজতে লাগলাম। এক্ষেত্রে ব্যর্থতার অপর নাম মৃত্যু বোধ হতে লাগলো আমার কাছে। *ব্যর্থ* শব্দটি আমার অভিধান থেকে পুরোপুরিভাবে মুছে দেয়ার চেষ্টায় নামলাম কোমর বেধে।

অবশেষে ডাটাবেজ–এ মিল খুজে পেলাম।

পেলাম আমারই ইভকে।

বাড়ির খুব কাছাকাছি হওয়ার সুবাদে পরিচয় পর্বটা আগে থেকেই ছিল। যাকে বলে দেখা হয়নি চোখ মেলে তাকে এতোদিন বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিনি। এখন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখার প্রতিটি মুহূর্তে চমকিত হতে থাকলাম নিজে নিজেই। অবশেষে নিজের স্বভাবজাত ভঙ্গিতে মনের ভেতরের আবেগের ভারী ভারী কথাগুলো খালি করে ফেললাম প্রথম সুযোগেই।

আমাকে অবাক করে দিয়ে আজীবন আমার এই ভারিত্বকে সানন্দে বহন করতে সে রাজি হলো।

সময়গুলো কাটছিল ম্যাগনেটিক রেলের গতিতে। দুজনে দুজনের মুণ্ডপাত করতাম, কিভাবে যে এতোদিন চলেছি এক্সপ্রেস রেলের গতি নিয়ে? যেহেতু বাবা মাকে কোনো কিছু গোপন করতাম না সুতরাং তাদেরকেও আমার নতুন গতিপ্রাপ্যতার ব্যাপারটি একটু জানালাম। তাদের ডাটাবেজ আমাকে খুব একটা হতাশ করলো না। তবে শর্ত একটাই, আগে পড়াশোনা শেষ করো।

সানন্দে রাজি হলাম।

এক দুই করে অনেকগুলো বছর পার করলাম। নিজেদের সম্পর্কের মাত্রাটা ধীরে ধীরে হিন্দি ছবি থেকে ইংরেজি ছবিতে মোড় নিতে লাগলো। সকলে স্বীকার করবে কি না জানি না। তবে আমরা বিশ্বাস করতাম এতো কাছাকাছি দুইজন মানব–মানবী যতোখানি সম্ভব নিজের ভালো–খারাপ মুহূর্তগুলো অনবরত নিজেরা শেয়ার করছি। কতোকাল আর হিন্দি ছবির মতো ডায়ালগ এবং রোমান্টিক স্বপ্ন দেখে গান গেয়ে দিন কাটে?

দেহগত বিদ্যার চূড়ান্ত পর্বটা শিকেয় তুলে রেখে ছোটখাটো কামজ বিদ্যাগুলোকে আবিষ্কার করছিলাম। সেই সঙ্গে নিত্যনতুন অনুভবের আবেশে বুদ হয়ে থাকতাম। বিজ্ঞানীদের কাছে তাদের নতুন আবিষ্কারের যতোটা না আনন্দ, আমাদের আবিষ্কারটাও কোনো অংশে কম ছিল না। মোট কথা, আমরা প্রতিটা মুহূর্ত গল্প করে, আড্ডা মেরে, মেলায় ঘুরে, তর্ক করে, কল্পনা করে এবং সামান্য কামজ বিদ্যাগুলো ঝালাই করে উপভোগ করতাম।

জন্মদিনটা আমার ক্রমেই কাছে আসছিল।

আমি জানি, বরাবরের মতো আমার কাছে জানতে চাওয়া হবে আমার কোনো অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষার কথা। মনে মনে ভয়ংকর একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। যদিও বা জানতাম আমার এই অভিলাষ ও আদৌ রক্ষা তো রক্ষা, সহ্য করতে পারবে কি না!

দিন ক্ষণ, সময় উপগত হলো। পরিকল্পনা মাফিক ভাবীর বাসায় নিভৃতে দুজন হাজির হলাম।

অভিলাষের কথা জানতে চাওয়ায় তার কানের কাছে বোমা ফাটালাম, তোমাকে পুরোটা না হোক দুই–তৃতীয়াংশ নিরাভরণ দেখতে চাই। সেই সঙ্গে শর্ত হিসেবে বস্ত্র উন্মোচন পর্বটায় আমার অংশগ্রহণ হলেও হতে পারে। তবে পর্বটি আমার সামনে ঘটাতে হবে। মোট কথা, চোখ বন্ধ করার পর্বটি অনুপস্থিত থাকবে।

আমার অদ্ভুত অভিলাষ ও চোখে চোখ রেখেই শুনলো। শেষের দিকে বারকয়েক তার দৃষ্টি অবনত হলো। চেহারার পরিবর্তন বলতে তার গাল দুটো শুধু লালচে বর্ণ ধারণ করলো। বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই উল্টো শর্ত আরোপ হলো।

দেবীকে শুধু দুই চোখ ভরে দেখতেই পারবেন, পূজাও করতে পারেন। তবে ছোয়া একেবারে বারণ।

খেলোয়াড় সুলভ চুক্তি।

রাজি হলাম।

আমি অবাক হয়ে উন্মোচন পর্ব অবলোকন করতে লাগলাম। নিজের মধ্যে আত্মউপলব্ধি জাগলো। অতি মাত্রায় কোনো সৌন্দর্যই সহ্য করা যায় না। সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমার আবারও মাথাটা নুয়ে গেল।

আশ্চর্য তার সৃষ্টি!

মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতিটি সৃষ্টিই যে অতি মহান তা আবারও অনুভব করলাম। আমার দৃষ্টি অনেক আগেই মেঝের দিকে।

কতোক্ষণ ও রকম ছিলাম জানি না।

তার অস্ফুট *চলো* শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাসা থেকে বের হলাম।

তার প্রতি আমার প্রচণ্ড ভালোবাসার সঙ্গে সেদিন থেকে শ্রদ্ধাবোধটিও যোগ হলো। সেদিন থেকে মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আমি যদি বেচে থাকি, তার যদি কোনো রকম অমত না থাকে তাহলে আজ থেকে তার সমস্ত দায়দায়িত্ব আমার, শুধুই আমার।

ঘটনার আরো বছর খানেক পর আজ আমাদের বিয়ে। কোনো প্রকার কলেমা ছাড়াই মধ্য রাতে বাসরঘরে ঢুকলাম। প্রতিটা মুহূর্তেই তাকে নতুন রূপে দেখি। আজকে তো তাকে লাগছে পরীর মতো। যদিও পরী কোনোদিনও দেখিনি।

মোহভঙ্গ হলো যখন আদেশ হলো টিউবলাইটা বন্ধ করে নীল ডিম লাইটটা জ্বালানোর।

এরপরই তার অভিনব অভিলাষ শ্রুত হলাম।

আমার সেই জন্মদিনটার মতো বস্ত্র উন্মোচনের পালাটা এখন আমাকে সারতে হবে। তাও আবার বিয়ের প্রথম দিনে, নওশা সাজে!

এ যে পৃথিবীর কতো কঠিন একটা কাজ ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন! এবার চোখ বন্ধ করার পালা আমার। মনে মনে নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছিলাম। কি কুক্ষণেই না আমার মাথায় সেই উন্মোচন পর্বটি ঢুকেছিল? হায়!

জীবনে প্রথমবারের মতো সমস্ত শরীরে আমার ইভের শরীরের স্পর্শ পেলাম।

বেডসুইচ বন্ধ হওয়ার শব্দ যে এতো মধুর হতে পারে তা বুঝি কোনোদিনই জানতাম না!

অন্ধকারে কানে কানে তার ফিশ ফিশ আওয়াজ শুনলাম, Tit for tat - টিট ফর ট্যাট!

*নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

# সুইটহার্ট

– কপোতাক্ষ

সুইটহার্ট বলে প্রথম যেদিন তুমি আমায় ডাকলে, আমি কপট বিস্ময়ে জানতে চেয়েছিলাম, সুইটহার্ট মানে কি?

একটু ভেবে তুমি উত্তর দিয়েছিলে, সুইটহার্ট মানে..., সুইটহার্ট মানে হচ্ছে তুমি!

এরপর থেকে আমাকে সুইটহার্ট বলেই তুমি ডাকতে আর আমিও তোমাকে। সুইটহার্ট তুমি কেমন আছো? কতোদিন তোমায় দেখি না!

সেই কবে ২০০২–এর শেষ জুলাইয়ে তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। তুমি এসেছিলে আমাকে দূরের জেলার বাসে তুলে দিতে। বাসটা যখন ছাড়লো পেছন ফিরে তাকিয়েছিলাম। তুমি দাড়িয়ে আছো বিষণ্ন মুখে। সেবারই প্রথম বিদায়ের সময় আমার পেছনে ফিরে তাকানো। অথচ এর আগে কখনোই বিদায়ের সময় পেছনে ফিরে তাকাতাম না। এ নিয়ে তোমার হয়তো কৌতূহল ছিল। কিন্তু জানতে চাওনি। আমিই তোমাকে বলেছিলাম, কেন তোমাকে পেছনে ফিরে দেখবো? যেখানে জানি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছেই।

তুমি বলেছিলে, আমি পেছন ফিরে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। এই জন্য যে, তোমাকে যতোক্ষণ দেখি ততোক্ষণ আমার মন শান্তিতে থাকে। তুমি যখনই আমার চোখের আড়াল হও, আমার মন অস্থিরতায় ভোগে।

অথচ আজ কতোদিন হয়ে গেল তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় না। এ জন্যই কি শেষবার পেছনে ফিরে তোমাকে দেখেছিলাম?

মনে আছে, একবার তুমি লিখেছিলে, আমি একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম পূর্ণিমার ওই চাদের দিকে আর ভাবছিলাম তুমি এই মুহূর্তে কি করছো। চাদের মাঝেই দেখেছিলাম তোমার মুখ। তুমি কি ভুলেও একবার চাদের দিকে তাকিয়েছিলে? আজ যখন আকাশে পূর্ণিমার চাদ ওঠে, তাকিয়েই থাকি। সুইটহার্ট, অস্ট্রেলিয়ার আকাশের চাদে তুমি কি আমার মুখ দেখতে পাও?

তুমি দেশের বাইরে চলে যাও, সেটা তুমি–আমি দুজনেই চেয়েছিলাম। কারণ তোমার–আমার ভালোবাসা এই সমাজ যে, কখনোই মেনে নেবে না, আমরা জানতাম। তাই চেয়েছিলাম তুমি দেশের বাইরে গিয়ে সেটলড হলে আমিও হয়তো চলে যাবো তোমার কাছে। অথচ তোমার এ যাওয়াটা যে এমন হবে সেটা কখনো ভাবিনি। যেমন ভাবিনি একদিন যে, তোমার সঙ্গেই আমার প্রেম হবে।

সেই সময়টাতে সদ্য আমার একটা সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবার আমি সর্তক ছিলাম। না, আর হুট করে প্রেমে পড়া নয়। ভেবে চিন্তে পা ফেলতে হবে। শুরু হলো বন্ধু খোজা। MIRC. Yahoo এবং MSN–এর বিশেষ চ্যাট রুমে এ সময় কাটাই। এরই মাঝে একদিন কথা হলো MIRC–তে তোমার সঙ্গে। ওই পর্যন্তই।

এরপর আরো অনেকের সঙ্গেই কথা হলো। কিছুদিন পর আবারও তোমাকে নেটে পেলাম। হাই, হ্যালো-র পরই বুঝলাম তোমার সঙ্গে আমার আগেও কথা হয়েছে। জানলাম আমরা দুজন একই এলাকায় থাকি।

এরপর হঠাৎ একদিন তোমার মেইল পেলাম। ততোদিনে ভুলেই গিয়েছিলাম তোমার কথা। জানতে চাইলাম তুমি কে? একই সঙ্গে আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই লিখলাম। তোমার রিপ্লাইতে তুমি তোমার টেলিফোন নাম্বার দিয়ে বললে, টেলিফোনেই তোমার সম্পর্কে তুমি বলবে। কিন্তু আমার আর টেলিফোন করা হলো না। কিছুদিন পর আবারও একদিন চ্যাট রুমে তোমার সঙ্গে আমার দেখা। এবার সিদ্ধান্ত নিলাম দেখা করবো দুজনে। দেখা হলো দুজনার। এবং শুরু হলো এক নতুন গল্পের।
প্রথম দেখায় আমরা একজন আরেকজনের কথা বলেছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম ভালোলাগার, ভালোবাসার কথা। বুঝতে চেয়েছিলাম যাকে খুজছি এই সে কি না। এরপর আবার আমাদের দেখা হলো, তারপর আবার। তখন পর্যন্ত আমরা কেউই বলিনি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তবে তৃতীয় দেখার দিন যখন রিকশায় পাশাপাশি বসে ফিরছিলাম, অনেক দ্বিধা, সংকোচ এবং জড়তা কাটিয়ে বললাম, মে আই হোল্ড ইয়োর হ্যান্ড?
তুমি *শিওর* বলে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, নাউ আই অ্যাম দি হ্যাপিয়েস্ট ম্যান।
তখনই আমরা বুঝলাম উই আর ইন লাভ!
অবশ্য তোমাকে হ্যাপিয়েস্ট ম্যান করার তখনো কিছু বাকি ছিল। আমাদের সেই লাল–নীল দিনগুলোতে তুমি ভালোবাসার সেই অমৃত বাণীটি উচ্চারণ করতে গভীর আবেগে এবং এক্সপেক্ট করতে আমিও সেই কথাটি তোমায় বলি। কিন্তু ভুলেও সে কথা তোমায় বলিনি। অবশেষে একদিন আমার ছুটি ফুরিয়ে গেলে কর্মক্ষেত্রে যাবার মুহূর্তে ফোন করে তোমায় বললাম, আই লাভ ইউ!
ফোনটা ছেড়ে দিয়ে কল্পনা করেছিলাম তোমার সেই মুহূর্তের আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের কথা।
আমি ছিলাম তোমার প্রথম প্রেম। তাই আমাকে নিয়ে তোমার উচ্ছ্বাস ছিল বেশি। তবে তুমিই আমার প্রথম ছিলে না সেটা তুমি জানতে। আমার অতীতকে তোমার সামনে তুলে ধরেছিলাম। এটা নিয়ে তোমার একটু দুঃখ ছিল বৈকি। কারণ যখন জানতে চাইতাম কতোটুকু ভালোবাসো?
তুমি বলতে, অ–নে–ক, অ–নে–কখানি।
পাল্টা প্রশ্নে জানতে চাইতে আমি কতোটুকু বাসি। বলতাম, তুমি যতোটুকু বাসো তারচেয়ে একটু কম। ওই কমটুকু তাদের জন্য যাদের আগে ভালোবেসেছিলাম।
আমি কেন তোমায় ভালোবাসলাম, তুমি জানতে চেয়েছিলে। বলেছিলাম, আই স মাই ডেসটিনি ইন ইউ।
আর, তুমি বলেছিলে,... যার মুখ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রথম ভালোবেসেছিলাম। পরে বুঝতে পেরেছিলাম তার মুখ দেখে নয়, তার মুখে যে মায়া ছিল তাই দেখে তাকে আপন করেছিলাম।
অথচ এ মায়াই একদিন কেমন যেন একটু একটু করে ফিকে হয়ে যাচ্ছিল। এটা বুঝতে পেরেই তোমাকে এক লাইনের একটা চিঠি লিখেছিলাম। অ্যাম আই লুজিং ইউ?
আমার চিঠিটা ফেরত এসেছিল আমার প্রশ্নের নিচে তোমার উত্তর নিয়ে।
*নো! ইউ আর নট লুজিং মি অ্যাট অল। ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাবাউট হোয়াট আই অ্যাম গোয়িং থ্রু। হোপ টু সি ইউ সুন।*
কি ঝড় বয়ে যাচ্ছে তোমার জীবনে সেটা আর শোনা হলো না। যেমন হলো না তোমার সঙ্গে শিগগিরই দেখা। কয়েকদিন পর হলমার্কের কার্ড পাঠালাম – সুইটহার্ট, উই বিলং টুগেদার।

সে কার্ডও ফেরত এলো। অবশ্য তাতে তুমি লিখেছো –

*আই অ্যাম লিভিং ফর অস্ট্রেলিয়া।... প্লিজ ডু নট রাইট টু মি এনি লেটার আনটিল আই গিভ ইউ মাই নিউ অ্যাড্রেস। ইফ ইউ ডু, মাই লাইফ উইল বি ইন জিওপারডি...।*

লাইফ উইল বি ইন জিওপারডি?

তবে কি বাসার সবাই জানতে পেরেছিল সেই ভয়ংকর কথা?

ছেলে হয়ে তুমি একটি ছেলেকেই ভালোবেসেছো!

তুমি একজন সমপ্রেমী!

এ ঝড়ই কি বয়ে যাচ্ছিল তোমার জীবনে?

জানা হলো না।

কারণ আমার প্রতি তোমার অ–নে–ক, অ–নে–কখানি ভালোবাসা নিয়ে তুমি আজ দূর পরবাসে কোনো রকম যোগাযোগ ছাড়া। এবং আমি, একটু কম ভালোবাসা নিয়ে বসে আছি অপেক্ষায় কবে তোমার নিউ অ্যাড্রেস পাবো?

kopotakhkho@hotmail.com

# পরীক্ষা

– বি.এ সুমন

**২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯**

পাশের দোতলার এনজিও কর্মকর্তা মিতাভাবী অফার করলেন তার সঙ্গে নিউ মার্কেট যাওয়ার জন্য। সানন্দে রাজি হলাম। মার্কেট থেকে ফিরে বাজার করা সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা দেখে ভাবী বললেন, তুই একটা বলদ।

এই কথায় মজা পেয়ে হেসে ফেললাম। বললাম, পরীক্ষা করেই দেখো না, আমি বলদ না ষাড়।

ভাবীও হেসে ফেললেন। তিনি বললেন, আচ্ছা অন্যদিন পরীক্ষা হবে, আজ আমার সাহেবের পরীক্ষা নেবো।

আসার সময় ভাবী একটি কনডম উপহার দিলেন।

আমিও সেটা মানিব্যাগে নিয়ে পকেটস্থ করলাম।

**১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০০**

আজ ভালোবাসা দিবস। আমার প্রিয়া জেরিন, বন্ধু মুশফিক ও জাভেদকে নিয়ে সারাদিন মজা করলাম। দুপুরে *মেরিভিয়ান রেস্টুরেন্টে* চায়নিজ খেলাম। বিল দেয়ার সময় মানিব্যাগ থেকে হতচ্ছাড়া কনডম খসে পড়লো। জেরিন আমার কোনো কথায় না শুনে দেড় বছরের সম্পর্কের ইতি টানলো। মুশফিক ও জাভেদও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো।

**২২ জুন ২০০০**

সকালবেলা মর্নিং ওয়াক–এ বের হয়েছি। ফিরে এসে দেখি আমার মানিব্যাগ নিয়ে ভাইয়ার ছেলে বাবু খেলছে। বুক কেপে উঠলো। শুনলাম মায়ের হই চই ও হট্টগোল। বাবা কোনো কথায় বললেন না, শুধু ঘাড় ধরে বাসা থেকে বের করে দিলেন।

কপর্দকহীন আমি সারাদিন অভুক্ত থেকে রাতে বটতলি রেল স্টেশনে আশ্রয় নিলাম। মশা সারা রাত আমার পুরুষত্বের পরীক্ষা নিল। ভোর রাতে রাস্তায় পুলিশ অযথা ঘোরাঘুরির জন্য ধরে নিয়ে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা নিল। সকালে আব্বা ছাড়িয়ে নিলে আমি হাপ ছাড়লাম।

মিতাভাবীর দেয়া উপহারটিতে তাকে পরীক্ষা দেয়া হলো না। দিলাম পুলিশ আর মশার কাছে। আর হারালাম অনেক কিছুই। তবুও মিতাভাবীকে ক্ষমা করে দিলাম।

*চট্টগ্রাম থেকে*

## ১২ এবং ওরা তিনজন

আমার মোবাইল ফোনের নাম্বারের শেষ দুটি সংখ্যা ১২ এবং আমার বয়স পয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। পাঠকরা অনুগ্রহ করে উপরের দুটি বিষয় মনে রাখবেন।

প্রায় দুই বছর আগে একদিন দুপুরের দিকে আমার মোবাইল ফোনে একটি মিসকল এলো। সেই একই নাম্বার থেকে আরো দুবার মিসকল এলো দেখে আমি কল ব্যাক করলাম।

একটি নারী কণ্ঠ প্রশ্ন করলো, আমার সঙ্গে কথা বলতে কি কোনো অসুবিধা আছে?

একটু ব্যস্ত ছিলাম, তবুও কৌতূহলী হয়ে বললাম, না, কোনো আপত্তি নেই।

সে কিছুক্ষণ কথা বলে তার আরো তিনজন বান্ধবীর সঙ্গে আমাকে ফোনে পরিচয় করিয়ে দিল। প্রথম দিন প্রায় ত্রিশ মিনিট কথা বলেছিলাম। অনেক বিষয় আলাপ হলো। প্রথম দিন তারা তাদের পরিচয় দেয়নি। আমিও জানতে চাইনি। মজাই লেগেছিল তাদের সঙ্গে কথা বলতে। বিশেষ করে আমার বয়সের একজনের সঙ্গে তারা নিঃসংকোচে কথা বলছিল তাই।

প্রথম আলাপের পর ভেবেছিলাম আর তারা মিসকল দেবে না। কিন্তু তারা আবারও কল করাতে তাদের সঙ্গে কথা বললাম। তাদের তিনজনের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। প্রায়ই কথা বলতাম। কখনো কখনো পঞ্চাশ থেকে সত্তর মিনিট পর্যন্ত।

তাদের নাম *ই, ক, ন।*

পুরো নাম বলবো না।

তখন তারা থাকতো একটি হস্টেলে। তাদের বয়স বাইশ তেইশের মধ্যে। এটা অবশ্য পরে জেনেছি। কিছুদিন আলাপের পর একদিন পরস্পরের সম্মতিতে দেখা করার সিদ্ধান্ত হয়। এর আগেই তাদেরকে আমার সম্পর্কে, আমার বয়স, আমি কি করি সব জানিয়েছি। ভেবেছিলাম আমার সম্পর্কে জেনে তারা হয়তো আর দেখা করবে না। কিন্তু তারা দেখা করলো।

প্রথম দিন ই এবং ন এলো দেখা করতে। আমার বিরবণ দিয়ে কোন গাড়িতে থাকবো ইত্যাদি জানিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঠিক সময়ে তারা এলো। দুজনেই বোরখা আবৃত। হাতে ফুলের তোড়া ও কার্ড। বোরখার নিচে ফুটফুটে চেহারার দুটি মেয়ে।

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তাদের দেখে। প্রাথমিক আলাপের পর তাদের নিয়ে রওনা হলাম আরিচার দিকে। পথে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় মানিকগঞ্জ থেকে ফেরত এলাম। অনেক কথা হলো। ভেবেছিলাম আমাকে দেখে সেদিনের পরে তারা আর দেখা করবে না। এরপরও বহুবার দেখা হয়েছে। তাদের নিয়ে অনেক জায়গায় লং ড্রাইভে গিয়েছি, নাটক দেখেছি।

তাদের প্রথম যৌবনের প্রাণচাঞ্চল্য ও চাপল্য আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে আমি একজন পয়তাল্লিশোর্ধ প্রৌঢ়। তাদের সঙ্গে গল্প, গান, আলাপে মিশে গেছি একাকার হয়ে। মনে হয়েছে আমি যেন ফিরে গেছি আমার প্রথম যৌবনে।

শিক্ষা জীবনের সর্বশেষ স্তরের পরীক্ষার্থিনী তারা ছিল সে সময়ে। এখন কৃতিত্বের সঙ্গে তিনজনই পাস করে গিয়েছে। তাদের তিনজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট তিন রকম।

*ন* একেবারে ছেলেমানুষ, একটুতেই মান-অভিমান, একটুতেই উচ্ছ্বাস।

*ক* খুবই রক্ষণশীল আবার আমার সঙ্গে আলাপে কোনো আপত্তি নেই।

*ই* একটু চুপচাপ প্রকৃতির। তবে মাঝে মধ্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে।

না পাঠক, আমাদের এই সম্পর্কের মধ্যে অন্য কিছু ভেবে বসবেন না। আমার অথবা তাদের কারোর মনেই অন্য কোনো খারাপ চিন্তা উদয় হয়নি। আমার নিজের কাছেই খুব অবাক লেগেছে এমন একটা অসম বয়সের সম্পর্ক গড়ে উঠলো কেমন করে?

ওরা আমার নাম রেখেছে ১২।

ইতিমধ্যে আমাদের পরস্পরের সম্বোধন আপনি থেকে তুই-তে নেমে এসেছে নিঃসংকোচে। তাদের দুইজনের ছেলে বন্ধু আছে।

ন এর বন্ধু ছ। কিন্তু আমাদের এই বন্ধুত্বের সম্পর্কটাকে ছ খুব সহজভাবে নেয়নি। সে রীতিমতো শাসন করেছে ন-কে, যেন আমার সঙ্গে না মেশে।

আমি খুব অবাক হয়েছি, হেসেছি মনে মনে। ভেবেছি কোথায় ছ আর কোথায় আমি? প্রতিদিন সকালে শেভ করতে গিয়ে নিজেকে তো আয়নায় দেখি। আমার প্রতিবিম্ব স্মরণ করিয়ে দেয় আমার বয়সের কথা। তাহলে ছ কেন আমার প্রতি জেলাস?

একদিন ছ-কে নিয়ে ন এসেছিল আমার অফিসে। কিন্তু ছ আসেনি অফিসের ভেতরে। ভেবেছিলাম ছ-কে বোঝাবো। বুকে টেনে ভেতরে আনতে গেলাম।

সে বললো, ডোন্ট টাচ মি। আই হেট ইউ। আমাকে ছোবেন না, আমি আপনাকে ঘৃণা করি।

ই-এর বন্ধু জু-ও আমার সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বটা পছন্দ করে না। অথচ তাদের বোঝাই কেমন করে, তাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটা কেমন।

ই, ন, ক-কে প্রশ্ন করেছি, তোরা কেন মিশিস আমার সঙ্গে?

ওদের উত্তর, ভালো লাগে।

কিন্তু যখন ওদেরকে আমার বয়সের কথা মনে করিয়ে দিই, ওরা হাসে। বলে, আমার সঙ্গে মিশবার সময়ে নাকি বয়সের কথা মনেই থাকে না। মনে হয় সমবয়সী।

খুব অবাক লাগে।

ওরা মাঝে মধ্যেই বলে, বারো, আমাদের যতো কথা হয় তার মধ্যে তুই এসে পড়িস।

আমি ভাবি, সত্যিই কি তাই?

২০০২ সালের যায়যায়দিন–এর *ভালোবাসা* সংখ্যার ১২৩ পৃষ্ঠায় ন লিখেছে।

ন, তুই যা লিখেছিস বারোকে নিয়ে তা কি তোদের মনের কথা? এমন তো হতে পারে, বছর কয়েক পরে তোদের এই বন্ধুত্বের মোহটা কেটে যাবে। তোদের যখন সংসার হবে তখন হয়তো আর আমাকে মনেই পড়বে না। মনে পড়লেও মুচকি হেসে মনে মনে বলছি, কি ছেলেমানুষিটাই না করেছিলাম।

তাদের নিষ্কলুষ সান্নিধ্য খুবই উপভোগ করি। যতোটুকু সময় এক সঙ্গে থাকি, ভুলে যাই নিজের বয়সের কথা। হাজার সমস্যার কথা। মনে হয় ফিরে গেছি সেই প্রথম যৌবনে।

মনে হয় আমি জীর্ণ পুরনো খাচার মধ্যে বন্দী চিরসবুজ টিয়া পাখিটার মতো ডানা ঝাপটাই। কিন্তু খাচা খুলে উড়ে যাওয়ার ক্ষমতা বা সাহস কোনোটাই নেই আমার।

অসংখ্য ধন্যবাদ তোদের ই, ক, ন।

মেনি মেনি থ্যাংকস।

*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*

# প্রিয় মানুষ

– মানজুরা সুলতানা

*এই রচনায় কোনো সম্পাদনা করা হয়নি। –যাযাদি*

যায়যায়দিন এর লেখা আহবান দেখে আমার খুব লিখতে ইচ্ছা হল। প্রথমে জানায় নিরপেক্ষ ওয়ার জন্য যায়যায়দিনকে অন্তর থেকে ভালবাসা এবং একগুচ্ছ লাল গোলাফের সুভেচ্ছা। আমি আজ কলম হাতে নিয়েছি এমন এক জনের সাথে ভালবাসার কথা লেখার জন্য। যাকে আমি কোনদিন দেখিনি শুধুমাত্র ছবিতে দেখেছি। সে আর কেও নয় সে আমার প্রিয় নেত্রী প্রধানমন্ত্রি খালেদা জিয়া। '৯৮ সাল থেকে আমি পেপার পড়ি। আর তখন থেকে উনাকে ভালবাসি আসছি। তখন থেকে আজ পর্যন্ত সব ছবি কেটে কেটে রেখে দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী তখন ছিলেন বিরোদী দলীয় নেত্রী।

আমি যানতামনা উনার ভাষণ ব্যতারে প্রচার হবে না। তাই আমি উনার ভাষণ শুনার জন্য একটা রেডিও কিনলাম। কিন্তু সাড়ে তিনটা বৎসর আমাকে অনেক কষ্টে কাটাইতে হইছে। কোনদিন উনার ভাষণ ব্যতারে শুনতে পাইনি। উনি ক্ষমতায় আশার জন্য আমি শত খতম কোরআন খতন পড়িছি। নামাজ পড়ি দোয়া করতাম উনি যেন ক্ষমতায় আসেন।

আল্লাহর আশেষ রহমতে উনি এখন ক্ষমতায়। উনার জাতীর উদ্দেশ্য দেয়া প্রথম ভাষণ শুনি আমার খুশিতে চুখের পানি চলে আসছে। প্রথম উনার কণ্ঠ শুনতে পেলাম।

এখন আমার জীবনে একটা আশা একটা স্বপ্ন উনাকে সরাসরী দেখা। কিন্তু আমি জানিনা আদৌ উনার সাথে আমার দেখা হবে কি না। যখন দেখি প্রধানমন্ত্রী কোন ছাত্রছাত্রিদেরকে পুরুস্কার বিতরণ করছেন বা কোন ছাত্রছত্রীদেরকে বই দিচ্ছেন তখন আমার খুব কষ্ট হয়। আহা যদি এতে আমিও থাকতাম। সেই দিন প্রধানমন্ত্রী মাদ্রাসার একটা ছোট ছেলের হাতে বই তুলে দিচ্ছেন তখন আমি একাটা দির্ঘশ্বাঃস ছেড়ে বললাম, আহা ছেলেটার কত বড় ভাগ্য। রমজান মাসে উনি যখন এতিমদের সাথে ঈফতার করেন তখন আমার খব ইচ্ছা হয় আহা যদি আমিও ওদের সাথে থাকতাম, ওদের কতো বড় সৌভাগ্য ওরা প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরী দেখতে পারতেছে।

এই কথাগুলা যখন লিখতে ছিলাম তখন খবরে শুনলাম প্রধানমন্ত্রি গরিবেরমাজে শিতবস্ত্র বিতরণ করছেন তখন নিজর ভাগ্যর জন্য খুব আফসুস হইল।

আমার পরিবারের সবাই আলেম। আমি নিজে একজন হাফেজ। আমার হাজবেন্টও একজন আলেম। আমাকে সবাই বলে তুমি খালেদা জিয়াকে এত ভালবাস কেন? খালেদা জিয়া তোমার কে? তখন আমি আহত হয়ে বলি কি করব আমি যে ভাল না বাসি পারি না। কেও উনার সমপর্কে খারাপ কথা বল্লে আমার খুব খারাপ লাগে। কেউ উনার ছবি ছিড়ে পেল্লে আমার চুখে পানি চলে আসে।

আমি নিজে ও জানি না আমি কেন এত ভালবাসি আমার মনে হয় আমার মত কেউ বুদ হয় এবাবে ভালবাসে না।

মাঝে মাঝে উনাকে স্বপ্নে দেখি তখন আমি মনে করি এটা বাস্তব, কিন্তু ঘুম থেকে উঠে দেখি এটা মিথ্যা। তখন আমার খুব খারাপ লাগে সে দিনটা একটুও ভাললাগেনা।

যাক উনার ভালবাসার কথা আর কত বলব বল্লে আর ও খারাপ লাগে কষ্ট টাকে আরও বাড়িয়ে দেয় তাই না বলাই ভাল। আমি জানিনা যায়যায়দিন আমার এই লিখা চাপাবে কি না হয়ত মনে করবে একটা ফালতু লিখা এটা কোন ভালবাসা সংখা হইল না। কিন্তু এর চেয়ে যে আমার আর কোন ভালবাসা নাই তাই এই খানে আমি শেষ করছি।

*খুলশী, আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম থেকে*

# কাপুরুষ

– গালিব

ক্লাস টুতে পরার সময় লীনারা আমাদের পাশের বাড়িতে ভাড়া এলো। একই ক্লাসের ছাত্রী হওয়ায় অল্প কয়েকদিনেই আমরা দুজন পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেলাম। লীনাকে মাত্র তিন বছর বয়সে রেখে তার মা মারা যাওয়ার কারণে আমার মা তাকে নিজের মেয়ের মতো দেখতেন। অবশ্য আমাদের মধ্যেও ভাইবোনের মতোই সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় হঠাৎ করেই মনে হলো তাকে আমি প্রচণ্ড রকম ভালোবাসি। তাই ওকে সরাসরি প্রস্তাব দিলাম এবং সে রাজি হয়ে গেল। তখন থেকেই আমাদের গোপন প্রেম চলতে লাগলো। কোনো বাড়ির কেউই অবশ্য ব্যাপারটা জানতো না। তবে আমাদের বিশ্বাস ছিল কোনো

পক্ষ থেকেই এ সম্পর্কের ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকবে না। এরপর দীর্ঘ প্রায় সাড়ে পাচ বছর গোপনে আমাদের প্রেম চলতে লাগলো। আমাদের সম্পর্কটা গোপন থাকলো। কারণ লীনা যদি সারাদিন আমাদের বাসায় বা আমার রুমে থাকতো তাহলেও কেউ কিছু সন্দেহ করতো না। আসলে ছোট থেকেই এক সঙ্গে, এক জায়গায় বড় হওয়ার সুবিধা ছিল এটা।

মাস্টার্স পাস করার পর যখন ছোটখাটো একটা চাকরি পেলাম তখন বাসায় আমার বিয়ের কথাবার্তা শুরু হলো। এখনে বলা রাখা ভালো, আমার বাবা মায়ের তিন মেয়ে এবং আমি একমাত্র ছেলে। তাও আবার সবার ছোট। কাজেই আমার বিয়েতে সবাই একটু বেশি হই চই করবে এটাই স্বাভাবিক। বন্ধুর মাধ্যমে বড় আপার কাছে লীনার কথাটা জানালাম। যেমন আশা করেছিলাম, কেউই কোনো আপত্তি করলো না।

৩ সেপ্টেম্বর ২০০০–এ এনগেজমেন্ট হয়ে গেল। ঠিক হলো ২৩ অক্টোবর গায়ে হলুদ এবং ২৫ অক্টোবর বিয়ে। সেই অনুযায়ী আয়োজন হতে লাগলো। নিজেকে সেই সময়ে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ মনে হতো। গায়ে হলুদের দুই তিন দিন আগে থেকে দুই বাড়িতে আত্মীয়স্বজন এসে জড়ো হতে লাগলো। হলুদের ঠিক একদিন আগে জামালপুর থেকে মেজখালা ও খালু এলেন। সমস্ত বাড়ি জুড়েই উৎসব শুরু হয়ে গেল।

হলুদের দিন সকালবেলা মেজখালু বেশ গম্ভীরভাবে বাবা মাকে তাদের ঘরে ডেকে নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ আলাপ করলেন। এবং কিছুক্ষণ পরই সারা বাড়িতে কেমন একটা ফিশফাশ শুরু হলো যা আমাকে দেখেই থেমে যায়।

মেজআপাকে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, বাবার ঘরে যা জানতে পারবি।

বাবা বিছানায় বসে আছে। বাবার পাশেই মা দেয়ালের দিক মুখ করে শাড়ির আচল দিয়ে মুখ ঢেকে বসে আছেন। মেজখালু খাটের পাশে একটা মোড়ার ওপর বসে আছে। বাবা আমাকে তার পাশে বসিয়ে খানিকটা নিচু স্বরে যা বললেন তা হলো, লীনার মা ভালো মেয়ে ছিলেন না। লীনার ছোট চাচার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। এ কারণে তাদের পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং এক পর্যায়ে লীনাকে মাত্র তিন বছর বয়সের রেখে তিনি আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনার পর তার বাবা লীনাকে নিয়ে আমাদের জেলায় এসে বসবাস করতে থাকেন। এই ঘটনা আজও প্রকাশ পেতো না যদি না সকালে বাড়ির সামনের রাস্তায় মেজখালুর সঙ্গে লীনার বাবার দেখা না হতো। লীনারা আর আমার খালুরা জামালপুরে একই পাড়ায় থাকতেন এবং সেখানে এই ঘটনা ঘটে।

আমাকে এ সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বাবা আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই মেজখালুকে সঙ্গে নিয়ে বিয়ে ভেঙে দিয়ে এল।

এবার আমাদের বাসায় সবাই বেশ সরবেই আলোচনা শুরু করলো। আমাকে এসে সান্ত্বনা দিয়ে সবাই বললো, এর চেয়ে ভালো মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে। লীনাকে নাকি কারোই তেমন পছন্দ হয়নি। শুধু আমি কষ্ট পাবো বলে এতোদিন কিছু বলেনি ইত্যাদি।

সবাইকে বলতে চাচ্ছিলাম যে, এতে তো লীনার কোনো দোষ নেই। যা করেছে তার মা করেছে। কিন্তু মায়ের গুণেই নাকি কন্যা পরিচিতি পেয়ে থাকে। তাই এই মায়ের মেয়ে কোনোদিন ভালো হতে পারে না। এও কোনো অঘটন ঘটাবে।

সারাদিন অস্থিরতার মধ্যে কেটে গেল। লীনার সঙ্গে দেখা করাটা সবচেয়ে জরুরি। কিন্তু বাসা ভর্তি আত্মীয়স্বজনের সামনে এই মুহূর্তে তাদের বাসায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। তাই এক বন্ধুর মাধ্যমে তার কাছে খবর পাঠালাম সন্ধ্যার পর যেন আমাদের বাসার পেছনে আমার সঙ্গে দেখা করে।

সন্ধ্যার পর পরই লীনা এসে উপস্থিত হলো। তার মুখোমুখি দাড়িয়ে নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হতে লাগলো। মনে হচ্ছে আমারই জন্য আজকে এ রকম কষ্ট পাচ্ছে।

আমি কিছু বলার আগেই সে বলে উঠলো, মবিন, চলো আমরা পালিয়ে যাই। অনেক দূরে যেখানে কেউ আমাদের চেনে না। আমি আর তুমি ছোট একটি বাসা ভাড়া নিয়ে থাকবো।

সে এমন একটি বিশ্বাসে কথাগুলো বলছিল যে, শুনে আমার মনে হচ্ছিল আমরা যেন সত্যি এ রকম একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি এবং এখনই পালাবো। পালানোর কথায় কেমন জানি ভয় ভয় করতে লাগলো। তাকে নিয়ে পালাবো বা পালিয়ে বিয়ে করতে হবে এ রকম কোনো চিন্তা আমার মাথায় কখনোই আসেনি। এমনকি আজকে এতো কিছু পরও তার মুখ থেকে পালানোর কথা শুনে কেমন ভয় লাগছে। লীনাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, এ রকম পালানো হবে বোকামি। তারচেয়ে আরো কয়েকটা দিন অপেক্ষা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অন্তত বাবা মাকে আমি রাজি করাতে পারবো। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে চাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত তার কাছ থেকে রাতের এ সময়টুকু চেয়ে বললাম, ভোরে তোমাকে আমার সিদ্ধান্ত জানাবো। এখন বাসায় যাও।

বুঝতে পারছিলাম আমার কথা তার পছন্দ হচ্ছিল না। তারপরেও সে বাসার দিকে হাটতে শুরু করলো। কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ করে আমাকে বললো, *কাপুরুষ।*

শব্দটা ভীষণভাবে আমাকে নাড়া দিল। সত্যিই আমি কি কাপুরুষ? তার সঙ্গে পালাতে ভয় পাচ্ছি? রাতে বিছানায় শুয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম লীনাকে নিয়ে পালাবো। ছক মোটামুটি তৈরি। ইচ্ছা করছিল এখনই লীনাকে গিয়ে খবরটা দিই। নিজেকে খুব উত্তেজিত লাগছিল। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনটা ভালো হয়ে গেল। লীনাকে আজ প্রমাণ করে দেবো আমি কাপুরুষ নই। এবং আজ থেকে শুরু হবে আমাদের সংসার।

রোজকার অভ্যাস মতো মাকে আমার রুমে চা দিতে বললাম। পালানোর ছক মোটামুটি ফাইনাল। তারপরও খুটিনাটি বিষয় নিয়ে ভাবতে লাগলাম। চা খেয়েই লীনাকে খবরটা দিতে যাবো। দুই ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে। ভাবনার ছেদ পড়লো মায়ের ডাকে, চা নিয়ে এসেছেন।

কাপটা নিলাম।

অন্যদিন মা চা দিয়ে চলে যান। কিন্তু আজকে দাড়িয়ে রইলেন। আমি কিছুটা ভয় পেলাম। মা কিছু টের পেলেন নাকি! হঠাৎ মা আমার নাম ধরে ডাক দিলেন, যা খুবই অস্বাভাবিক।

আমি অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাতেই মা বললেন, কাল রাতে লীনা গলায় দড়ি দিয়েছে।

*ফরিদপুর থেকে*

# সাবি

– সাদিয়া মেহের

বাবা রিটায়ার করার পর থেকে সংসারের দুর্গতির মিটার স্কেল সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উপরের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল বাবা–মায়ের মনোমালিন্য এবং ঝগড়াঝাটি। তবে এসব কুরুক্ষেত্রের বেশির ভাগই শুরু করতেন মা। ধৈর্যশীল ও বুদ্ধিমান স্বামীদের মতো বাবা এসব ক্ষেত্রে মৌনব্রত পালন করতেন। আক্রমণের মাত্রা কিছুটা কম মনে হলে মাকে তিনি বুঝাতেন, আল্লাহ আমাদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন। দোয়া করো যেন আমাদের সন্তানেরা সুসন্তান হয়। তবেই আমাদের দুঃখ–কষ্ট শেষ হবে। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত উপদেশের বান মাঝে মধ্যে বুমেরাং হয়ে ডাল–পালা ছড়িয়ে বাবার দিকে ফিরে আসতো। সেক্ষেত্রে উদ্ভুত পরিস্থিতি এড়াতে বাবা বাড়ি থেকে ওয়াকআউট করতেন।

তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। একদিন স্কুল থেকে এসে শুনি বাবা মা রাগ করে প্রথমে বাবা এবং পরে মা ঘর ছেড়েছেন। মা নাকি বলেছেন, এই পোড়ার সংসারে আর আসবেন না। বাবার এ রকম আচরণের সঙ্গে আমরা পরিচিত হলেও মায়ের *থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে* ধরনের মনোভাব আমাদের বিচলিত করলো। মা–ই হচ্ছেন অভাবের সংসারের মূল চালিকাশক্তি। তার অন্তর্ধান আমাদের অন্তঃস্থল কাপিয়ে দিল।

মন খারাপ করে ঘরের সামনে ছোট বাগানটায় গিয়ে বসলাম। অল্প জায়গায় খুব বেশি গাছ হওয়ার কারণে জায়গাটা দিনের বেলায় ছায়া সুনিবিড় এবং রাতে ছমছমে অন্ধকারে ছেয়ে থাকে। এসব কারণে বাগানটা বাসার সবার বেশ প্রিয়। বিশাল *বোগেনভিলা* গাছের টকটকে বেগুনি ফুল সবার আগে চোখে পড়ে। মনে পড়লো এই গাছটির নিচে বাবা–মায়ের কতো সুখ–দুঃখের বিকেল কেটেছে। নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

রাত নয়টার দিকে বাবা পরম নিশ্চিন্তে বাড়ি এসে হাত–মুখ ধুয়ে খাওয়ার টেবিলে বসলেন। তিনি ধরেই নিয়েছেন বাড়ির আবহাওয়া এখন শান্ত এবং ও বিপদ সংকেত নামিয়ে ফেলা হয়েছে। আগ্রহ নিয়ে এদিক–ওদিক তাকাচ্ছেন। অর্থাৎ মার খোজ করছেন। মনে মনে বাবার ওপর রাগ হলো। বলে না দিলে বাড়ির এমন ত্রাহি অবস্থা কি কিছুই বুঝে নিতে হয় না! বাড়ির প্রধান উপদেষ্টা বড়আপা সার্বিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে তার মতামত দিলেন। এমনকি সম্ভাব্য আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে ব্যর্থ ঝটিকা অভিযানের কথাও বাবা শুনলেন। আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছি।

বাবা অবাক বিস্ময়ে বড় বড় চোখ করে বললেন, ওস্তাগফিরুল্লাহ! কঠিন অবস্থায় পড়া গেল।

ধর্মান্ধ নয়, ধর্মভীরু বাবার এটি হচ্ছে পেটেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। যে কোনো জটিল পরিস্থিতিই বাবার জন্য কঠিন অবস্থা। ধৈর্যের চরম মুহূর্তে স্বয়ং বাড়ির কর্তার মুখে এমন হতাশাব্যঞ্জক কথা শুনে কেদে ফেললাম।

বাবা আমাকে কাছে টেনে নিলেন। খাওয়া ফেলে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন, চল মা, আমরা না হয় বাইরে কিছুক্ষণ হাটাহাটি করি। এর মধ্যে নিশ্চয়ই তোমার মা চলে আসবে।

আশার বাণী শুনে উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে গিয়ে সদর দরজা খুলি। বাইরে বাগানে পা বাড়াতে গিয়ে মনে হলো, ভূতের মতো কালো কিছু একটা সর সর শব্দে নড়ে উঠলো। প্রাণফাটা চিৎকার দিতে গিয়ে পরক্ষণে বুঝতে পারি অন্ধকারে বোগেনভিলা গাছের নিচে ভূত নয়, দাড়িয়ে আছেন মা। সম্ভবত কাদছেন। ঘরের আলো থেকে হঠাৎ বাগানের অন্ধকারে এসে কি ভীষণ দৃষ্টি বিভ্রাট।

বাবা আমার পেছনে এসে দাড়াতেই খুশি খুশি গলায় বলি, বাবা, মা এসেছেন।

কিছু না বলে বাবা এগিয়ে গেলেন মায়ের কাছে। ধবধবে শাদা পাঞ্জাবি পরা দেবদূতের মতো আমার বাবা তার শুভ্র হাতখানা মায়ের মাথায় রেখে বললেন, সাবি, ঘরে এসো।

মায়ের নাম ছিল সাবিরা। বাবা ডাকতেন সাবি বলে।

*পল্লবী, ঢাকা থেকে*

# ধোলাই দিবস

– আনিসুর রহমান রুবেল

ডিগ্রি পরীক্ষাটা দিয়েই ঢাকায় চলে এলাম। উদ্দেশ্য, বহু দিনের ইচ্ছেটা পূরণ করা। সেটা হলো, কমপিউটার শেখা। বন্ধু মতিন মালিবাগে একটা মেস ঠিক করে দিল। একটি নামকরা কমপিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে গেলাম।

আমি ছাড়া মেসের বাকি সদস্যরা সবাই চাকরিজীবী। বিকেলে ঘোরার সঙ্গী পাই না বলে প্রায় দিন সংসদ ভবন চত্বরে গিয়ে বসে থাকি। এ সময় বিভিন্ন ধরনের কথা কানে আসে।

যেমন যাবি রে?

কোন জায়গায়? কয়জন?

মিরপুর। চারজন।

পাচশ টাকা লাগবো।

চল।

বন্ধুদের মুখে শুনতাম, সংসদ ভবনের সামনে ভ্রাম্যমাণ পতিতা পাওয়া যায়। তখন বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এসব সংলাপ শুনে ও মেয়েদের দেখে বিশ্বাস করলাম। সমস্যা হলো, কোনটা পতিতা আর কোনটা পতিতা নয় সেটা বোঝা মুশকিল হয়ে দাড়ালো। অবশেষে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে এসব মেয়েদের চেনার কিছু বৈশিষ্ট বের করলাম।

**এক.** এরা সাধারণত শাড়ি পরে।

**দুই.** ঠোটে লাল রঙের লিপস্টিক থাকে।

**তিন.** মাথায় একটা ওড়না থাকে।

**চার.** কাধে কিংবা হাতে একটা ব্যাগ থাকে।

সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট হলো, এদের চোখের দিকে তাকালে বোঝা যেতো, এরা খদ্দের খুজছে।

কয়েকদিন পর ভালোবাসা দিবস। অথচ আমার কোনো ভালোবাসার মানুষ নেই। আমার খুব শখ ওইদিন একটা মেয়েকে নিয়ে রিকশায় করে ঢাকা শহরে ঘুরি।

সিদ্ধান্ত নিলাম, এবার মনের আশাটা পূরণ করবো। তবে একটু অন্যভাবে। ১৪ ফেব্রুয়ারি সংসদ ভবনে গিয়ে দেখতে সুন্দর এ রকম একটি মেয়েকে আমার সঙ্গে রিকশায় ঘোরার প্রস্তাব দেবো। এর বিনিময়ে মেয়েটিকে পাচশ টাকা এবং সুন্দর দেখে একটা জামা কিনে দেবো। মেয়েটি নিশ্চয় খুশি মনে আমার প্রস্তাব মেনে নেবে।

অবশেষে কাঙ্ক্ষিত ১৪ ফেব্রুয়ারি এলো। বিকেলে খুব সেজেগুজে সংসদ ভবন গেলাম। ভ্রাম্যমাণ পতিতাদের মধ্যে আমার সঙ্গে রিকশায় ঘোরার সঙ্গী নির্বাচন করার জন্য খুজছি। কিন্তু সুন্দর কোনো মেয়েকে দেখছি না। অন্যদিন এসব মেয়েদের খুব সুন্দর লাগতো।

আধঘণ্টা ঘোরাঘুরি করি মোটামুটি দেখতে সুন্দর এ রকম একটা মেয়েকে পছন্দ করলাম। মেয়েটি কয়েকজন খদ্দেরের সঙ্গে দরদাম করছে। কিছুক্ষণ পর লোকগুলো চলে যায়।

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর, বুকে সাহস নিয়ে মেয়েটির খুব কাছে গিয়ে নিচু গলায় বললাম, এই যাবি? পাচশ টাকা দিমু। শুধু রিকশায় ঘুরবি। আর কিছু না...।

কথাটা বলে শেষ করতে পারলাম না। দেখলাম, মেয়েটির পায়ের শক্ত বাটা কম্পানির জুতা আমার গাল স্পর্শ করছে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, মেয়েটি পতিতা নয়। অর্থাৎ পতিতা নির্বাচনে আমি ভুল করেছি। অথচ মেয়েটির ঠোটে লাল লিপস্টিক, পরনে শাড়ি, মাথায় ওড়না সবই আছে।

ইতিমধ্যে মেয়েটির গলার উচু স্বরে আকৃষ্ট হয়ে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। কয়েকজন গায়ে হাত তোলা শুরু করে দিয়েছে। অবশেষে মোটামুটি মানের একটা ধোলাই দিয়ে আমাকে ওরা ছেড়ে দিল।

ওই ঘটনার পর প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে পাক্কা দশ দিন বিছানায় শোয়া ছিলাম।

আবারও ১৪ ফেব্রুয়ারি আসছে। এদিন সবার কাছে ভালোবাসা দিবস হলেও আমার কাছে হলো ধোলাই দিবস।

*ইমামগঞ্জ, ঢাকা থেকে*

# শেষ পর্যন্ত তোমাকে চাই

– শারমীন জাহান অনি

১৪ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে তোমাকে জানাতে চাই তোমাকে আমি কতো ভালোবাসি।

*প্রথমত আমি তোমাকে চাই*

*দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই*

*শাড়ি কিনতে গেলে আমি তোমাকে চাই*

*চায়নিজে গেলে বিল মেটাতে আমি তোমাকে চাই*

*ট্যাকসি ক্যাবে ঘুরতে আমি তোমাকে চাই*

*কসমেটিকস কিনতে গেলে আমি তোমাকে চাই*

*গহনা কিনতে আমি তোমাকে চাই*
*তোমার মানিব্যাগ ভরা থাকলে মরণের আগ পর্যন্ত আমি তোমাকেই চাই।*
*সত্যি, সত্যি, সত্যি।*

*দোহার, ঢাকা থেকে*

# মামা

– শিবলী সুহান লিপু

ছোটবেলা থেকেই ভিউকার্ড সংগ্রহ করার শখ ছিল। বড় ভাইবোনেরা যখনি বাড়িতে আসতেন, আমার জন্য ভিউকার্ড আনতেন। বিভিন্ন উৎসবে বন্ধুরা মিলে ভিউকার্ড দেয়া–নেয়া করতাম। পুরনো ভিউকার্ড খুজতে গিয়েই আমার এ গল্পের শুরু।

একটার পর একটা ভিউকার্ড বের করছি আর কে, দিয়েছে, কতো সালে, কি নাম সব দেখছি। বিদেশি ছোট একটি মেয়ে একটি ছোট ছেলেকে চুমু খাচ্ছে। কার্ডের পেছনে নাম কেয়া, তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ সাল। লেখাগুলো কাচা হাতের। সেই সময় আমাদের দেশে ভ্যালেনটাইনস ডে পরিচিত ছিল না আজকের মতো। তাই তো ওই ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখ দেখে কেয়ার কথা আমার মনে পড়ে গেল।

তখন আমি হাই স্কুলের ছাত্র। শহরে বাড়ি হলেও সেই সময় খুব খেলাধুলা করতাম ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে। আশপাশের বিশ পচিশ বাড়ি চষে বেড়াতাম। পাশের বাসায় নতুন ভাড়াটিয়া আসে। তারা কয়েক বোন। তাদেরকে আপা বলে ডাকতাম। কারণ আমার ভাইবোনেরা তাদের আপা বলতেন। ওই ভাড়াটিয়াদের বড় বোনের মেয়ের নাম কেয়া। বাবা নেই। কেয়ার দিকে তাকিয়ে তার মা আর বিয়ে করেননি।

কেয়া আমার ছোট এবং আমাকে মামা বলে ডাকে। সে এসে আমার গ্রুপে যোগ দেয়। ক্যারম, দাড়িয়াবাধা, সি–বুড়ি, লুকোচুরি আরো অনেক খেলা খেলতাম। কখনো বা আমার কাছে সে অংক কষতে আসতো। ঘুমানোর সময় এবং স্কুলের সময় বাদে সব সময় আমাদের বাড়িতেই সে থাকতো। আমার একটা লিডার লিডার ভাব ছিল এবং সবাই তা মেনে নিতো। সেই জন্য বেশি সুযোগ কেয়াকে দিতাম। যে কোনো খেলায় আমার দলে সবাই সদস্য হতে চাইতো। কিন্তু কেয়া এসে সেই সুযোগ বন্ধ করে দিতো। ক্যারম খেলার সময় তাকে সঙ্গী করতাম। লুকোচুরি খেলার সময় তাকে নিয়ে লুকোতাম।

একদিন বাড়ির সামনে একা বসে আছি। তখনো খেলতে কেউ আসেনি। কেয়া একটা ভিউকার্ড আমার হাতে দিল। কার্ডটা দেখার আগেই সে আচমকা একটা চুমু দিয়ে চলে যায়।

ভিউকার্ডটা বাড়িতে এনে রাখি। তারপর দেখি কেয়া আমাদের বাড়িতে খুব একটা আসে না। খেলতে এলেও আমার পাশে বেশি আসে না। আমাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে, এমনকি আমাকে মামা বলেও আর ডাকে না। শুক্রবারে সবাই এক সঙ্গে কার্টুন দেখতে যেতাম, তাতেও সে আসে না। বরই পাড়তে যেতাম, তাতেও সে আসে না।

তাকে একদিন ডেকে বললাম, তুমি কেন আমাকে এড়িয়ে চলো?

কোনো কথা না বলে চলে যায়।

আরেকদিন শক্ত করে তাকে ধরলাম। কিন্তু সেদিনও কিছু বলাতে পারলাম না। খেয়াল হলো সে আমাকে আর কোনো কিছু বলেই ডাকে না। আমাকে শুধু একা একা নিয়ে বেড়াতে চায়। রেললাইন, ফিশারি পুকুরঘাট, কৃষি ইন্সটিটিউট, ভকেশনাল, স্টেডিয়াম অর্থাৎ যে জায়গাগুলোতে আমরা ঘুরে বেড়াতাম, খেলতাম।

একদিন সে জোর করে আমাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেল। তখন মেয়েদের সিটে বসেই সিনেমা দেখতাম। দুইজনে সিনেমা দেখলাম। জীবনে এই প্রথম আমার বাড়িতে না বলে সিনেমা দেখা। কিন্তু বাড়িতে আমাদের সিনেমা দেখার কথা টের পায়নি। আমি কেয়ার মনোভাব একটু একটু করে বুঝতে পারলাম। তখন তো আমার দুরন্ত কৈশোর। খেলার তালে পড়লে সব ভুলে যাই। আমার তখন খেলাধূলা আর স্কুল ছাড়া অন্য কিছুই মনে হতো না। এখন ভেবে পাই না কেয়া অতোটুকু বয়সে কেমন করে বৈষয়িক বিষয়টা বুঝলো। আসলে মেয়েদের বুদ্ধি মনে হয় একটু তাড়াতাড়ি পাকে।

এভাবে চলতে চলতে তারা একদিন বাড়ি বদল করে অন্য পাড়ায় চলে গেল। প্রতি ঈদে আমাদের বাড়িতে আসতো। আমিও মনের অজান্তে ঈদে তার জন্য অপেক্ষা করতাম। কিন্তু কিছুই বলতাম না। তখনো সে আমাকে মামা ডাকে না। আমিও কেয়ার বাড়ি মাঝে মধ্যে যেতাম। প্রায় কোনো ঈদেই বাদ যেতো না তার আসা এবং আমরা এক সঙ্গে রিকশায় ঘুরতাম। তাকে মুখ ফুটে কোনো কিছুই বলতে পারিনি। মাঝে মধ্যে ইশারা–ইঙ্গিতে বুঝিয়েছে। তবে আমি না বোঝার ভান করে থেকেছি।

যখন কলেজে পড়ি তখনো তার সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা হতো। স্বাধীনতা দিবসে তার সঙ্গে স্টেডিয়ামে দেখা। তখন সে মনের কথা সম্পূর্ণ খুলে বললো। আমার মনের মধ্যেও তখন একটু একটু করে সে জায়গা করে নিয়েছে। ভাবতেই পারছিলাম না কেউ আমাকে এভাবে করে বলবে।

মনের কথা মুখ ফুটে না বলতে পেরে ভালো মানুষ সাজলাম। বললাম, মামা হয়ে ভাগনির সঙ্গে কিভাবে...।

আমার কথা শেষ না হতেই বন্ধু সজল এসে উপস্থিত। কথা আর এগিয়ে গেল না। মাঝপথে থেমে গেল। তারপর মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে ঈদে তার বাড়িতে গেলাম। দরজা খুলতেই আমাকে বললো, আ রে মামা, কেমন আছেন।

আমার তখন কি অবস্থা হয়েছিল সে বর্ণনা নিজে দিতে পারবো না।

গত বছর কসমেটিকসের দোকানে তার সঙ্গে আবার দেখা। সঙ্গে ফুটফুটে একটা মেয়ে সন্তান। মেয়েকে কোলে নিলাম। মেয়ের নাম রেখেছে শিনা। শিনাকে বললো, তোমার মামা।

হায়রে কপাল!

মায়েরও মামা, মেয়েরও মামা!

অথচ বাবা হওয়ার কথা ছিল।

*গাইবান্ধা থেকে*

# ছাগল

– এস. মনি

সেই ছোটবেলা থেকে এতো লাজুক ছিলাম যে, সব সময় ঘরের মধ্যে থাকতে পছন্দ করতাম। যখন এইচএসসিতে পড়ি তখনো গিয়ে মানুষ অর্থাৎ খালাতো মামাতো বোনদের সঙ্গে লজ্জায় কথা বলতে পারতাম না। তাছাড়া কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়াকালে বিয়াইন গোছের ঢেউটিনগুলো আমাকে বিয়াই বলে ক্ষেপাতো এবং বলতো, আপনি একটা মেয়ে মানুষ, কিছুই বোঝেন না।

আমার লজ্জার মূল কারণ বলে যা মনে করতাম তা হলো, লাইফে কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলবো না, প্রেম করবো না। কিন্তু আমি সময়ের পরিবর্তনে আজ আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ব্যর্থ।

১৯৯৯–এর মাঝামাঝি সময়ে একটা কোচিং সেন্টারে ক্লাস নিতাম। হঠাৎ একদিন এক মহিলার সঙ্গে দুইটা মেয়ে পড়তে আসে। প্রথম দেখাতেই শিলু নামের মেয়েটির প্রতি দুর্বল হয়ে গেলাম এবং মনের গভীরে ভালোবাসার ভুবন সৃষ্টি করে ফেললাম। এরই ফাকে একদিন শিলুর খালার মাধ্যমে জানতে পারলাম কোচিং বাদ দিয়ে শিলুকে বাসায় গিয়ে পড়াতে হবে।

শুরু করলাম পাঠদান।

পার হয়ে গেল প্রায় আড়াইটা বছর।

সেদিন ছিল রবিবার। প্রতিদিনের মতো সেদিনও টিউশনি করতে গেলাম শিলুদের বাসায়।

পড়ার ফাকে শিলু আমাকে একটা মাছ আকৃতির কাগজ ধরিয়ে দিল এবং বললো, এটা যত্ন করে রাখবেন।

পরদিন থেকে শিলুর আচরণের আরো পরিবর্তন দেখতে পেলাম। পড়ার ফাকে একদিন শিলু আমার গা ঘেষে দাড়িয়ে আলুঙ–ফালুঙ করছে।

বললাম, পড়তে বসো।

শিলু মুখ ভেংচি দিয়ে জিভ বের করে বললো, প–প–পড়।

শিলুর এমন আচরণ দেখে সামনে দাড়িয়ে প্রচণ্ড আবেগে শিলুকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলাম।

কিছু সময় পর শিলু নিজেকে ছাড়িয়ে চোখ বড় বড় করে বললো, ছাগল কোথাকার।

আমি শিলুর ভালোবাসার ছাগলে পরিণত হয়ে গেলাম।

এখনো শিলু সুযোগ পেলেই আমাকে তার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে ঠোটে কিস দেয় আদর করে। মাঝে মধ্যে মাথার চুলে হাত দিয়ে আদর করে। শিলু আমার প্রথম লাজুক মনের প্রেম, প্রথম ভালোবাসা। আর শিলুর প্রথম ভালোবাসার ছাগল আমি।

*পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, বাসাবো, ঢাকা থেকে*

# বিভক্ত বাংলা

– মোহাম্মদ আকরাম হোসেন

প্রায় হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিটা ফিরে পেল আনিস, যাযাদির সেন্ট ভ্যালেনটাইনস ডে–র জোরালো ধাক্কায়। সুদীর্ঘ সময়ের অবিরাম প্রবাহে কিছুটা মলিন বটে কিন্তু একেবারে স্বচ্ছ ঝকঝকে, তকতকে একটা ছবি। দীর্ঘ দিন অযত্নে পড়ে থাকা কাচের ফ্রেমে বাধানো অস্বচ্ছ প্রায় ছবির উপর থেকে ধুলোবালির স্তরটা ঝেড়ে ফেললে যেমন কাচের ভেতর থেকে উকি মারে স্বচ্ছ ছবিটা ঠিক তেমনি।

নমিতা! নমিতা ঠাকুর! বারো বছরের এক কিশোরী, শ্যামলা রঙ, গোলগাল চেহারা, অপরূপ সুন্দরী। অন্তত আনিসের চোখে।

অবাক হয় আনিস, এতোটা স্বচ্ছতা নিয়ে এখনো কিভাবে জেগে আছে তার স্মৃতির পাতায়। জেগে আছে ভারতের সেই কালীঘাট গ্রাম, সেই ছোট্ট নদীটা, সেই ঠাকুর বাড়ি। তারানাথ ঠাকুর আর কলিম মণ্ডল। পাশাপাশি বাড়ি, ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী আপন ভাইয়ের মতো। ধর্মের পার্থক্য আটকাতে পারেনি দুটো পরিবারের সহজ মেলামেশা, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিবিধ লেন–দেন।

আনিস আর নমিতা সমবয়সী, সহপাঠী। একই সঙ্গে পড়াশোনা, খেলাধুলা, চলাফেরা, অনেক ক্ষেত্রে খাওয়া–দাওয়াও। তাদের অনুরাগ, সহজ স্বাভাবিক। ভালোবাসা চেষ্টা করে গড়া নয়, সহজাত। জন্মের পরে নয়, ভালোবাসা নিয়েই যেন জন্মেছে তারা। একটা শিশু জন্মেই যেমন জেনে ফেলে পৃথিবীর আলো বাতাসের ওপর তার সহজাত অধিকারের কথা। পারস্পারিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল তারা দেহ ও মনে। কিন্তু তাতে কখনো বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগেনি কারো মনে। প্রথমত. অপ্রাপ্ত বয়স্কতার কারণে অপরিণত দৈহিক অবস্থা। দ্বিতীয়ত. উভয় পরিবারের দীর্ঘ দিনের পারস্পারিক সুগভীর আস্থার জন্য।

একদিন ফাস হয়ে গেল সব। দীর্ঘ অভ্যাসের কারণে তাদের মধ্যে অসাবধানতা এসেছিল অনেকটাই। এক ছুটির দুপুরে নিরিবিলি ঘরে বরাবরের মতো লেখাপড়ায় ব্যস্ত অবস্থায় তারা হয়ে উঠে আদিম মানব–মানবী। স্থান–কাল ভুলে মেতে উঠে আদিম আনন্দে। এমনটা এর আগে হয়নি কখনো। এ জন্য বাড়ির পাশের জঙ্গলটাই ছিল একমাত্র আদর্শ স্থান।

ভাগ্যটা খারাপই ছিল। না হলে এ সময়ে তো সকলেরই নিজ নিজ ঘরে অভ্যাস মতো ঘুমিয়ে থাকার কথা। হঠাৎ করেই কাকিমা অর্থাৎ নমিতার মা ঘরে ঢুকলেন। বিস্ময়ে হতবাক। কোনো রকমে শুধু বলতে পারলেন, এতোটুকু বয়সে এতো অধঃপতন, এতো বিশ্বাসের এই ফল!

দুটো দিন আনিসের কাটলো অত্যন্ত বিশ্রীভাবে। অসুস্থতার অজুহাতে ঘরের কোণে পড়ে রইলো। ঘটনাটা কোন দিকে মোড় নিচ্ছে কিছুই বোঝার উপায় নেই। কারণ কাউকেই তো কিছু জিজ্ঞাসা করার উপায় নেই।

তৃতীয় দিন দিবাগত রাত। পর পর দুই রাত ঘুমহীন কাটানোর ফলে একটু সকাল সকালই ঘুমিয়ে পড়েছিল আনিস। কার যেন সতর্ক ধাক্কাধাক্কিতে চোখ মেলতেই দেখতে পেল পাশে দুলাভাই। ফিশফিশিয়ে বললেন, খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে। হাতে সময় খুব কম।

কোথায় একটু সাহস করে জিজ্ঞাসা করলো আনিস।

পাকিস্তানে।

ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলো আনিস। পাশে মা দাড়িয়ে, দুই চোখে তার অবিরল পানি ঝরছে। একটু দূরে অধোবদনে বাবা দাড়িয়ে। ঘুম জড়িত অসহায়, বিষণ্ন চোখে ঘরের চার পাশটায় একবার চোখ বোলালো আনিস। উঠে দাড়াতেই পাশে এসে সস্নেহে মাথায় হাত রেখে মা বললেন, বাচতে চাইলে এছাড়া কোনো উপায় নেই বাবা।

দুলাভাইয়ের সঙ্গে চোখের জল ভেসে বাইরে বেরিয়ে এলো আনিস। বড্ড ইচ্ছা হলো, নমিতাকে যদি শুধু একটিবার দেখতে পেতো।

ঘুটঘুটে আধার রাত। সামনে কিলো দুই তিন মেঠো পথ। পেছনে হিংস্র এক মৃত্যু ছোবল। ঘণ্টা খানেক দ্রুত পা চালিয়ে উভয়পক্ষের কোনো রকম বাধা–বিঘ্ন ছাড়াই বর্ডার অর্থাৎ ছোট্ট নদীটা পেরিয়ে পূর্ব বাংলার মাটিতে পা রাখলো এরা। পেছনে পড়ে রইলো অনতিক্রম্য পশ্চিম বাংলা।

নদীর ওপারেই আনিসের চাচার বাড়ি। তাকে পৌছিয়ে দিয়ে দুলাভাই বললেন, এখানেই তোকে থাকতে হবে আপাতত এবং আজীবন এই পূর্ব বাংলাতেই। যাবার সময় হাতে গুজে দিল ভাজ করা এক টুকরা কাগজ।

চাচি বিছানা ঠিক করে দিয়ে চলে গেলেন। ঘরে একাকী আনিস। এক কোণে টিমটিমে একটি বাতি জ্বলছে। বাতির অস্পষ্ট আলোয় কাগজখানা মেলে ধরলো চোখের সামনে। নমিতার চিঠি।

***প্রিয় আনিস,***

*আমার ভালোবাসার শেষ বিন্দু তোকে দিলাম। এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তোকে বাচিয়ে রাখলে আমার বিয়ের সময় অঘটন ঘটতে পারে অথবা ঘটনা ফাস হয়ে গেলে আমার প্রভাবশালী অভিজাত ব্রাহ্মণ বাবার মানসম্মান ধূলায় লুটাতে পারে এই ভয়ে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামীকাল রাত বারোটার পর বাড়ি থেকে তোকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া হবে চিরদিনের মতো। আজ রাতে সে বিষয়ে সমস্ত ষড়যন্ত্র শেষ হয়েছে। তুই তো জানিস, বৌদি আমার মতো তোকেও খুব স্নেহ করেন। বৌদিই সমস্ত ঘটনা আমাকে জানালে আমি অত্যন্ত গোপনে দুলাভাইকে* (দুলাভাই যার বাড়ি আনিস ও নমিতার বাড়ি থেকে একটু দূরে একই গ্রামে) *সব বলে এসেছি। হয়তো তোর বাবা মাকেও অচিরেই পশ্চিম বাংলা ছাড়তে হবে।*

*তোর সঙ্গে হয়তো জীবনে আর কোনোদিন দেখা হবে না। জানি না আমার ভাগ্যে কি আছে। কিন্তু তুই তো বাচ! আমাকে কোনোদিন ভুলে যাস নে আনিস।*

*ইতি –*

*তোরই* ***নমিতা***

বারকয়েক পড়লো আনিস চিঠিটা। শিউরে উঠলো বাবা মায়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে। কিন্তু কোনো উপায় নেই।

কতোক্ষণ এমনি ভাবলেশহীন অবস্থায় বসেছিল খেয়াল নেই। আজানের শব্দে সংবিৎ ফিরে পেল। আধার এখন অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে। জানালা দিয়ে আবছা দেখা যাচ্ছে ছোট্ট নদীটা। অখণ্ড বাংলাকে দুই ভাগে চিরে দিয়ে একে–বেকে চলে গেছে কে জানে কোথায়?

*মথুরাপুর, কুষ্টিয়া থেকে*

# রাজনীতি ও প্রেমনীতি

– ইসমাইল মোহাম্মদ

**ঐকমত্যের প্রেম**

মনের সঙ্গে যদি মন মিশে যায়, চোখের সঙ্গে চোখ, ব্যস, হয়ে গেল প্রেম, ঐকমত্যের প্রেম। অতএব নেই কোনো প্রবলেম। খাও–দাও ফুর্তি করো। সংসদ ভবন, বলধা গার্ডেন, পাবলিক লাইব্রেরির চিপায় মুখে–মুখ, বুকে–বুক, দেহ–মনে অথৈ সুখ। অথবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখোমুখি অলস বসে থাকা। চিনেবাদামের খোসা ছড়াতে ছড়াতে চোখের তারায় আকাশ দেখা। যতোদিন আকর্ষণ আছে, তুমি আছো, আমি আছি আকর্ষণ ফুরালেই দ্বিমত, ভেঙে যায় ঐকমত্য। তারপর দুজনার দুটি পথ দুদিকে।

**আপোসহীন প্রেম**

প্রথমত আমি তোমাকে চাই, দ্বিতীয়ত. আমি তোমাকে চাই, শেষ পর্যন্ত আমি তোমাকে...। তোমার জন্য আমি ফেন্সি খাবো, প্যাথিড্রন নেবো, তবুও তোমাকে চাই। তোমাকে না পেলে আমিও নেই। গাছের ডালে ছাগলের দড়ি বেধে অথবা সিলিং ফ্যানের সঙ্গে শাড়ি পেচিয়ে ঝুলে পড়বো।
আপোসহীন প্রেম এমনি কড়া, এমনি বেপরোয়া। জীবনে কোনোদিন ব্লাড ব্যাংকে রক্ত দেয়নি এক ফোটাও। অথচ রাত জেগে রক্ত অক্ষরে চিঠি লেখা, হাতে ব্লেড চালিয়ে প্রেমিকার নাম লেখা।

**অসাংবিধানিক প্রেম**

বিল ক্লিনটন একে বলেছেন অসংগত সম্পর্ক। অর্থাৎ পরকীয়া প্রেম। যে প্রেম বিধান সম্মত নয়। চতুর বাওয়ালী হয়ে অন্যের মৌচাক থেকে চুপিসারে মধু খাওয়া। অনেকটা এরশাদীয় স্টাইল।
পরকীয়া প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নেই তাই। ব্যাকডেটেড কবির এই তত্ত্ব এ যুগে অচল। পরকীয়া প্রেমে সিদ্ধহস্ত এক ব্যাচেলর যুবকদের সাফাই – *গণিমিয়ার নিজের জমি নাই, তাই সে অন্যের জমি চাষ করে।* ওর মতে, পরকীয়া প্রেম হলো ঝামেলাহীন নিষ্কণ্টক ভালোবাসা। ফসল হলে মালিকানার দায় নেই।

**স্বৈরাচারী প্রেম**

তুমি শুধু আমার, কেবলই আমার। প্রেমিকার ওপর এ ধরনের এক তরফা মালিকানা দাবি করাই হলো স্বৈরাচারী প্রেম। আমাকে তোমার ভালোবাসতেই হবে। না হলে আমি তোমার মুখে এসিড

ছুড়বো। প্রয়োজনে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে...। এ ধরনের হুমকি-ধামকির মাধ্যমে জবরদস্তি ভালোবাসা আদায়ই হলো এ জাতীয় প্রেমের বৈশিষ্ট। তুমি যদি কাল থেকে সিগারেট না ছাড়ো তো...। প্রেমিকের প্রতি যখন তখন এ ধরনের ফরমান বা অধ্যাদেশ জারি করাও স্বৈরাচারী প্রেমের পর্যায়ভুক্ত।

**একদলীয় প্রেম**

একদলীয় প্রেম হলো অনেকটা ওয়ান সাইডেড লাভ বা একতরফা প্রেম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ প্রেম অপ্রকাশিত। মনের কথাটি মনেই গুমরে মরে। সাহসের অভাব, লাঞ্ছনার ভয় যদি পাছে লোকে কিছু বলে। অতএব... সারাক্ষণ উদাস উদাস ভাব। প্রেমিকার পায়ের শব্দে বুক ধড়ফড় করা। কণ্ঠ শুনে চমকে ওঠা, তারপর বিনিদ্র রজনী, শাদা কাগজে কবিতার জঞ্জাল, বলবো? কিন্তু... কিভাবে বলি। যদি সে ভুল বোঝে? ইত্যাদি সব মনোবিকার। হঠাৎ একদিন পাখি উড়ে যায়, রয়ে যায় তার পালক। এক বুক দীর্ঘশ্বাস, সারা জীবন হা-হুতাশ।

**সুবিধাবাদী প্রেম**

এ ধারার প্রেমিক-প্রেমিকারা ধরো তক্তা, মারো পেরেক তত্ত্বে বিশ্বাসী। খোলা মাঠ বা পার্কের নির্জনতার চেয়ে চায়না রেস্তোরার আলো-আধারীতে কিংবা বেডরুমের উষ্ণ নিবিড় পরিবেশই এদের বেশি পছন্দ। এরা নগদ লেনদেনে অভ্যস্ত। দেবে আর নেবে, মিলবে, মেলাবে...।

সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের দলবদলের মতো এ শ্রেণীর প্রেমিক-প্রেমিকারা আবার ঘন ঘন সঙ্গী পাল্টায়। আসলে প্রেম নয়, এদের মূল লক্ষ্য হলো বাড়ি, গাড়ি, ব্যাংক-ব্যালান্স বা রাজকন্যাসহ রাজত্ব। রাজনীতিকদের নির্বাচনী ব্যয়ের মতো এরা প্রেমিকার পেছনে প্রচুর সময় ও অর্থ ইনভেস্ট করে এবং পরে তা সুদ-আসলে উসুল করে।

*ঢাকা থেকে*

# ছবি

– সেলিনা খান ছোটন

আমার বাবা এবং সব চাচারা সত্তর দশকে ছিলেন আওয়ামী লীগের অন্ধ ভক্ত। চাচাতো ভাইদেরকেও দেখতাম আওয়ামী লীগের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে, তর্ক করতে। আমাদের ঢাকার বাসার বিশাল ড্রইংরুমে শেখ মুজিবর রহমানের বিশাল একটা ফটো আমার বাবা বাধাই করে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। তখন ওনাকে কেউ ছবিটি টাঙাতে বলেননি বা বাধ্য করেননি। আমার বাবা অ্যাডভোকেট ছিলেন। তিনি মারা গেছেন।

ওনার এক অ্যাডভোকেট বন্ধু একবার আমাদের বাসায় বেড়াতে এলেন। তারপর বাবার সঙ্গে গল্পগুজব করে নাশতা খেয়ে চলে গেলেন।

বাবার বন্ধুটি চলে যাবার পর গেলাম ড্রইংরুমটাকে আবার একটু গুছিয়ে রাখতে। গোছাতে গিয়ে দেখি ড্রইংরুমে শেখ মুজিবের সেই ছবিটা নেই!

বাসার সবাই খোজাখুজি করলো। কিন্তু পাওয়া গেল না। আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলাম। ছবিটা গেল কোথায়? বাবার বন্ধুটি নেবেন সেটাও বিশ্বাস হচ্ছিল না।

বেশ কিছুদিন পর বাবা তার সেই বন্ধুটির চেম্বারে গিয়েছিলেন কি একটা কাজের জন্য। গিয়ে দেখেন শেখ মুজিবের সেই ছবিটা তার চেম্বারে টাঙানো। আমার বাবা তো অবাক! তখন তার মনে পড়ে গেল সেদিন বন্ধুটির হাতে বড় একটা ব্যাগ ছিল। আর সেটাতে ভরেই তিনি অপকর্মটি করেছেন। তবুও বাবা ভদ্রতা রক্ষা করে ওনাকে কিছুই বললেন না। কিন্তু ছবিটা বাবার খুব প্রিয় হওয়ায় তিনি সেটা তার বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে এনে আবার আমাদের ড্রইংরুমে টাঙিয়েছিলেন।

আমার বাবা বার বার ছবিটি টাঙিয়েছিলেন তার ভালোবাসার কারণে। সেই আমলে ছবিটা টাঙানোর জন্য কেউ বাবাকে আদেশ করেননি। আর বাবার বন্ধুর চেম্বারে টাঙাতেও কেউ তাকে বলেননি। বাবার বন্ধুটিও তার ভালোবাসার কারণেই ছবিটা চুরি করে নিয়ে টাঙিয়েছিলেন। ভালোবাসা আসলে এমনই হয়।

তাই আমাদের নেতানেত্রীদের বলছি, জোর করে ভালোবাসা পাওয়া যায় না। জোর করে ছবিও টাঙানো যায় না। এমন কিছু করুন যাতে মানুষের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। তখন বলতে হবে না। সাধারণ জনগণ ভালোবাসার টানেই আপনাদের ছবি টাঙাবে।

*মেহেদীবাগ, চট্টগ্রাম থেকে*

## রকমফের

– মেজবাহউদ্দিন সাকিল

ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে হরেকরকম কিছু ভালোবাসার গল্প পাঠকদের শোনাচ্ছি। এই গল্পগুলোর কিছু মা–বাবার কাছ থেকে পাওয়া। কিছু নিজস্ব।

**যুদ্ধ**

১৯৭১ সাল। চারদিকে যুদ্ধের ডামাডোল। চাদপুর–কুমিল্লা মহাসড়কের প্রায় সবগুলো বৃজই ক্ষতিগ্রস্ত। পাকিস্তানি আর্মিরা সেই ক্ষতিগ্রস্ত বৃজ আবার বানাচ্ছে। মা ও মামার সঙ্গে ছয় মাস বয়সী আমি মামাবাড়ি যাচ্ছি। বাবুরহাট বৃজের কাছে আমাদের বাস থামানো হলো। মহিলা যাত্রীদের লাইনে দাড় করিয়ে রেখে পুরুষ যাত্রীদের বৃজের কাজে লাগিয়ে দেয়া হলো। মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে দুইজনকে গাড়িতে তোলা হলো। বোরকা পরিহিত মহিলা যাত্রীদের সামনে দিয়ে একজন অফিসার হেটে যাচ্ছেন। বেলুচ ভাষায় নোংরা মন্তব্য করছেন। দুই একজনের মুখের নেকাব তুলে ক্রুর হাসি হাসছেন।

আমার মায়ের সামনে এসে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি নাকি আমাকে ছো মেরে ছিনিয়ে নিলেন। শূন্যে ছুড়ে আবার ধরেও ফেললেন। কপালে এবং গালে চুমু খেতে খেতে বললেন, এই লেড়কা মুক্তি ফৌজ হো গিয়া?

আমার মায়ের চোখ দিয়ে তখন আপনা-আপনি পানি বের হচ্ছিল। যেহেতু ছয় মাস বয়স, কথা বলতে পারি না তাই অফিসারের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম অন্যভাবে। পরম মমতায় অফিসারের ইউনিফর্ম সিক্ত করেছিলাম।

মা আমার আশা ছেড়েই দিলেন। অফিসারটি বিরক্তিতে আমাকে ছুড়ে ফেলে দেবেন এই দৃশ্য না দেখার জন্য মা চোখ বুঝলেন। মাকে অবাক করে দিয়ে তিনি তার নয়নমণিকে কোলে ফিরিয়ে দিয়ে ইউনিফর্ম ঝাড়তে ঝাড়তে অফিসারটি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

তৎকালীন পাকিস্তানি আর্মিদের নৃশংসতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু বেলুচ সেই অফিসারটির ছিটেফোটা ভালোবাসায় আজ আমি একত্রিশ বছরের যুবক। আমার মাও পুত্র হারানোর ব্যথায় শোকাতুর নন।

**ক্ষিধে**

১৯৭৪ সাল। দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে উচ্চবিত্ত ছাড়া সবাই পর্যুদস্ত। কিছুই মনে নেই। তবে খুব ঝাপসা কিছু দৃশ্য চোখে ভাসে। সেই বছর লাউ-এর ফলন হয়েছিল প্রচুর। ভাতের ক্ষিধে মেটানোর জন্য অল্প মসলায় (মসলার দাম আকাশ ছোয়া হওয়ায়) দুই তিনটি লাউ এক সঙ্গে রান্না করা হতো। রান্নাঘরে বসে ভাতের বদলে লাউ খাওয়ার দৃশ্য আমার অস্পষ্ট মনে ভাসে।

হই চই শুনে দৌড়ে গেলাম বাড়ির বাইরের কাছারি ঘরের সামনে। বিস্ফারিত চোখে দেখলাম হাড় জিরজিরে দুইজন মানুষ কাচা জ্যান্ত টাকি মাছ কামড়ে খাচ্ছে।

বাবা আজ আমাদের জন্য গরুর মাংস এনেছেন। ঘটনাটি আমার মনে নেই। বড় বোনের কাছ থেকে শোনা। বাড়িতে অনেক দিন পর সবার চোখ চকচকে। কচু-ঘেচুর বদলে গরুর মাংসে চোখ চকচক করারই কথা। মোটামুটি সেদ্ধ (লাকড়ি, মসলা ও তেলের অভাবে) করে গরুর মাংস খাওয়ার আয়োজন চলছে। এমন সময় বড় চাচি এসে কড়াইয়ের সমস্ত মাংস রান্নাঘরের পাশে ডোবায় ছুড়ে ফেললেন। আমরা সবাই নির্বাক।

ক্ষিধে কি এতোই বেড়ে গেছে যে মরা গরুর মাংস খেতে হবে? কাপড়ের আচল থেকে কিছু টাকা বের করে বাবাকে দিয়ে বললেন, যাও, জ্যান্ত গরুর মাংস এনে বাচ্চাদের খাওয়াও।

ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলাই হচ্ছে ধর্মের প্রতি ভালোবাসা। সন্তানদের আনন্দিত চোখকে ভালোবেসে ধর্মীয় ভালোবাসাকে বাবা জলাঞ্জলি দিলেন। ক্ষিধে হয়ে উঠলো ধর্মের চেয়ে বড়।

হাড়কিপ্টে বড় চাচী কিসের ভালোবাসায় দুর্মূল্যের বাজারে মাংস কেনার টাকা দিলেন? ধর্মের ভালোবাসায়? ক্ষিধে মেটানোর ভালোবাসায়? নাকি আনন্দিত চোখের ভালোবাসায়?

**ঘৃণা**

স্বৈরাচারী এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চারদিকে। জগন্নাথ কলেজে পড়ি। *স্বৈরাচার নিপাত যাক* স্লোগানের প্রস্তুতি চলছে। হঠাৎ আর্মির একশন। দেয়াল টপকানোর সময় পায়ে গুলিবিদ্ধ হলাম।

জীবন বাচাতে খোড়াতে খোড়াতে কলেজের পাশের একটা বাসায় গিয়ে উঠলাম। বিস্ফোরণমুখী অবস্থার মধ্যেও পরিবারটি আমাকে লুকাতে চেষ্টা করলেন। ফ্লোরে রক্তের দাগ মুছতে লেগে গেলেন। ব্লিডিং বন্ধ করানোর আপ্রাণ চেষ্টা চলতে লাগলো। এমন সময় আর্মি এসে দরজায় দাড়ালো।
গৃহকর্তা দরজা খুলে দিলেন। অনুমতির অপেক্ষা না করে তাকে ঠেলে সরিয়ে ভেতরের রুম থেকে আমাকে টেনে হিচড়ে বের করা হলো। পরিবারের সকলের চোখ বেদনাবিধুর। মন ও শরীরের বাইরে স্বৈরাচারের প্রতি ঘৃণা থেকেও যে ভালোবাসার সৃষ্টি হয়, টলমলে চার জোড়া চোখই তার প্রমাণ।
আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে। টর্চারের ভয়াবহ স্মৃতি মনে করতে গিয়ে আজও চমকে উঠি। হাতের দশটি মরা নখ এবং যুবক বয়সেই মাথার পাকা চুল আয়নায় দেখে একজন মিথ্যুক, ভণ্ড, প্রতারক, কামুক স্বৈরাচারীর চোখে মুখে থুথু দিই।
তবে মরা নখ এবং শাদা চুলের জন্য আমার স্ত্রী কখনো হীনম্মন্যতায় ভোগেনি। আমার অনাকাঙ্ক্ষিত পাকা চুল নিয়ে কখনো রসিকতা করেনি। আমার শাদা চুলকে এবং মরা নখকে ভালোবেসে তৎকালীন স্বৈরাচারীকে অভিসম্পাত করা অন্যান্য ধর্মীয় কাজের মতোই একটা কাজ হিসেবে বেছে নিয়েছে।

**দৈহিক ভঙ্গী**

ক্লাস ফাইভের একটা ছাত্রী পড়াই। বেশ ধনী। বয়স বড়জোর বারো। হঠাৎ একদিন চিঠির মাধ্যমে আমাকে প্রেম নিবেদন করে বসলো।
রাগে গজ গজ করতে করতে জিজ্ঞাসা করলাম, এ রকম ধারণার জন্ম হলো কি জন্য?
আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, ছেলেদের এতো সুন্দর চোখ কি ভালো?
টিউশনি ছেড়ে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

**আরেক ঘটনা**

পৃথিবীতে এতো সুন্দরী মেয়ে থাকতে আপনি আমাকে ভালোবাসা নিবেদন করলেন কেন?
হাসলে এবং রাগলে আপনার গালে টোল পড়ে। পৃথিবীতে খুব সম্ভবত এ রকম দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না।
কপট রাগ এবং দুষ্টু হাসি, দুই গালে দুটি টোল।
আশ্চর্য!
তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে অথবা তোমার অফিস কি রাত নয়টা পর্যন্ত? উভয় বাক্য প্রয়োগের শেষান্তে গালে টোল। ছুয়ে দিতে ইচ্ছা হয়।

**ঝগড়া**

তুমুল ঝগড়া চলছে। স্ত্রীর মুখ দিয়ে খই ফুটছে, স্বামীপ্রবর চুপ অথবা স্বামীর লম্ফঝম্ফ, স্ত্রী ফৃজ। নিষ্পত্তি ঘটে দুই দেহ এক হওয়ার মাধ্যমে।

ভালোবাসাবাসি শেষে মুগ্ধ চোখে একে অপরের দিকে তাকিয়ে ফিশফিশিয়ে বলা, একেবারে বেহুশ হয়ে গেছো, এবার শান্তি তো। বুঝি তো ঝগড়ার আয়োজন কি জন্য।

**নিঃস্বার্থ**

স্কুল থেকে ফিরে মা খেতে বসেন বিকাল পাচটায়। মাঝে মধ্যে আমি আশপাশে থাকি। আমাকে কাছে টেনে জোর করে ধরে মুখে ভাতের লোকমা তুলে দেন। এটা নিঃস্বার্থ নয় – মা, ছেলের রক্তের বন্ধন। কি জন্য জানি না তিনি খেতে বসলে একটি বিড়াল, একটি কুকুর, দুটি কাক, দুটি মুরগি, একটি চড়ুই তাদের স্ব স্ব স্থান থেকে খাওয়ার ভাগ চায়। নিজের খাওয়ায় যতোটুকু পরিমাণ ও সময় খরচ হয় তারচেয়ে বেশি খরচ হয় এদের আপ্যায়নে। পাশের কাঠাল গাছটিও আপ্যায়ন থেকে বাদ যায় না। খাওয়ার উচ্ছিষ্ট এবং হাত প্লেট ধোয়া পানি দিয়ে আপ্যায়িত করা হয় কাঠাল গাছকে। নিঃস্বার্থ ভালোবাসা নয় কি?

*খিলগাও, ঢাকা থেকে*

## জীবন্মৃত

বিপ্লব, হ্যা আমার ভালোবাসার বিপ্লব। সে ছিল আমার স্বপ্নের নায়ক ভারতের আমির খানের মতো। সে সময় *কেয়ামত সে কেয়ামত তক* ছবিটি খুব হিট হয়েছিল। তখন ভিসিপি–তে আমি ছবিটি ছয়বার দেখেছিলাম। আর এখন *দেবদাস* অনেক বার দেখেও দেখার সাধ মেটেনি। ছবিটি দেখতাম আর বিপ্লবকে কল্পনা করতাম। সতেরো বছরের এক টিনএজ মেয়ে এভাবে আস্তে আস্তে নিজের মনের অজান্তেই বিপ্লবকে ভালোবেসেছিল।

বিপ্লবের আচার–ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। দুজনে একই কলেজে পড়তাম, বিভাগও একই। প্রাইভেট পড়তাম একই ব্যাচে। কিন্তু কেমন যেন একটা ভয় ও লজ্জায় তা প্রকাশ করতে পারিনি। প্রচণ্ড কষ্ট পেতাম। পড়ালেখা করতাম না। অথচ ছাত্রী হিসেবে খারাপ ছিলাম না। এইচএসসি টেস্ট পরীক্ষা যেদিন শেষ হয়েছিল সেদিন নিজেকে অনেক কন্ট্রোল করে তার কাছ থেকে একটি ছবি চেয়েছিলাম। সে আমাকে কিছুই বলেনি। শুধু হেসেছিল। জানি না সেই হাসি হতাশার নাকি ভালোবাসার। তার কোনো সাড়া না পেয়ে বাসায় যাবার জন্য রিকশায় উঠতে যাবো এমন সময় আমাদের অন্য বন্ধু খোকন আমার হাতে একটা চিরকুট দিয়ে বললো, বিপ্লব দিয়েছে। খুলে দেখি কোনো সম্বোধন নেই। শুধু লেখা আছে :

*তুমি যা বলেছো বা চেয়েছো তা কোনোদিন সম্ভব হবে না। আমি এমন একজন ছেলে যে নিজেকে নিজে চিনতে হিমশিম খাচ্ছি। হতাশা আমাকে ঘিরে রেখেছে। সত্যিই আমি অক্ষম। প্লিজ, এক্সকিউজ মি।*

চিরকুটটা পড়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই যেন কেমন হয়ে গেলাম। দুই চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করলাম। সে রাতেই ১০৪ ডিগ্রি জ্বর। প্রায় এক সপ্তাহ জ্বর ছিল। সেই যে কলেজ থেকে ফিরেছি আর যাইনি। বাবা চাকরির সুবাদে রাজশাহী থাকতেন। আমি মাকে ফাকি দিয়ে বলতাম, এখন কলেজে ক্লাস চলে না। মায়ের চোখকে তো আর ফাকি দেয়া যায় না। মা কিভাবে যেন ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলেন। তারপর কোনো রকমে সেকেন্ড ডিভিশনে এইচএসসি পাস করি।

একদিন তাকে বাসায় একা পেয়ে বললাম, তুমি, আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছো। আমি তোমাকে কখনো ক্ষমা করবো না।

সেদিনও সে হেসেছিল। আর এই সাহসী মেয়েটি ভালোবাসার কাছে পরাজিত হয়।

পরবর্তী কালে নিজের ওপর প্রচণ্ড অভিমানে তার সঙ্গে যেন দেখা না হয় সে জন্য মফস্বল জেলা সদরের একটি কলেজে বিএ-তে ভর্তি হই। সে আওয়ামী লীগ করতো। ইচ্ছা করে আমি ছাত্র ইউনিয়নে জড়িয়ে পড়ি। সেখানে অবশ্য ইউনিয়ন-এর প্রভাব বেশি ছিল। স্বৈরশাসক এরশাদের পতনের সময় লুকিয়ে দলের কাজ করতাম। কারণ আমরা থাকতাম সামরিক এলাকায়।

ইউনিয়ন থেকে কলেজ সংসদে নির্বাচন করলাম। আমাদের প্যানেল জয়ী হলো। ভিপি, জিএসসহ আমরা চারজন বিএ ক্লাসের হওয়ায় কলেজ বাসটা প্রায়ই আমাদের দখলে থাকতো। সব বন্ধু-বান্ধব মিলে কলেজ বাস নিয়ে আজ এখানে তো কাল ওখানে চষে বেড়াতাম। হই-হুল্লোড় আর আনন্দের মাঝে সেই দিনগুলো কেটে গিয়েছিল। বিপ্লবের কষ্ট কিছুটা ভুলে গিয়েছিলাম। তবে কাউকে ভালোবাসা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তারপর লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিই। নিজেকে সব সময় ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করি। প্রতিষ্ঠানপ্রধান হিসেবে অনেক দায়িত্ব আবার স্বাধীনতাও আছে। খুব ভালো লাগে।

এখন মাঝে মধ্যে আমাদের দোতলা বিল্ডিংয়ের বারান্দায় দাড়িয়ে মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। নিঃসীম শূন্যে বিপ্লবকে খুজে বেড়াই। কল্পনার সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে হঠাৎ আজানের শব্দে বাস্তবে ফিরে আসি। এই ১৪ বছরে এক মুহূর্তের জন্যও তাকে ভুলতে পারিনি। আজও বুঝতে পারিনি, কোন অপরাধে, কোন অযোগ্যতায় সে আমাকে ফিরিয়ে দিল।

বিপ্লব, কেন তুমি এমন করলে? অদৃষ্টের পরিহাসে হয়তো তোমার ঘরণি নাইবা হলাম। তুমি কি পারতে না আমার দুঃখ সুখের বন্ধু হতে? আমাকে জানাতে? তোমাকে জানতে কতো সাধ ছিল। জানি মুখে মুখে হবে না আমাদের কোনোদিন জানাজানি। তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি হয়তো তুমি যা নও তাই করে। বিপ্লব, বর্তমানে আমি মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত।

শুনেছি বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর তুমি দেশ ছেড়েছো। আমিও মনে প্রাণে চেয়েছিলাম বিএনপি ক্ষমতায় আসুক। কারণ আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় থাকতে তোমাদের জয় জয়কার ছিল। অর্থাৎ তোমাদের অধঃপতন হয়েছিল। তখন তোমাকে রিপোর্টিং করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যেতে হতো। খুব খুশি দেখাতো। এখন লন্ডনে যাওয়ায় ব্যবস্থাও কি তোমার দল করে দিয়েছে? বিএনপি তোমাকে রিপোর্টিং থেকে বাদ দিয়ে আমার বড় ক্ষতি করলো। তোমাকে আর দেখতে পাই না। তোমাকে দেখতে, তুমি কেমন আছো, কোথায় আছো জানতে ইচ্ছা করে।

বিপ্লব, তুমি জেনে রেখো পৃথিবীতে এমন একজন মানুষ আছে যে তোমাকে এখনো খুব! খুব!! খুব!!! বেশি ভালোবাসে। তোমার এয়ার হস্টেস বৌকে নিয়ে সুখে থেকো। আমার জীবদ্দশায় ভুল করে হলেও দুই ফোটা চোখের জল উৎসর্গ করো। আমি জীবন্মৃত।

পুনশ্চ : বিপ্লব, যায়যায়দিন পড়ে না। কারণ...? বিপ্লবের পরিচিত কোনো সহৃদয় পাঠক তাকে যায়যায়দিন পড়তে উৎসাহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

*নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

# সাইকেল প্রেম

– মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান

আমি একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আমাদের বাড়িটা শহর থেকে বাইরে পাচ কিলোমিটার দক্ষিণে। ডিগ্রি পড়ি শহরের সরকারি কলেজে। তাছাড়া দুইটা টিউশনি করি শহরে। সেই সুবাদে দিনের তিন চতুর্থাংশই শহরে কাটাতে হয়। তাই শহরের একটি মেসে নিয়মিত বোর্ডার ছিলাম শুধু দুপুরের খাবারের জন্য এবং কিছুটা বিশ্রামের জন্য।

আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিল একমাত্র সাইকেলটা। এটা আমার মা কিনে দিয়েছিলেন বাড়ির গাছের ডাব আর কবুতর বিক্রি করে জমানো টাকা থেকে। সাইকেলটি ছিল আমার বন্ধুর মতো। তাকে ছাড়া কোথাও যাওয়ার কথা চিন্তাই করতাম না।

শহরে সিংহ ভাগ সময় থাকার সুবাদে কিছু ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। ছেলেগুলো উদার ও সংস্কৃতমনা হওয়ার কারণে আমি খুব তাড়াতাড়িই তাদের কাছের একজন হয়ে গেলাম। রোজ বিকেলে আমরা হসপিটালের পাশে একটা চায়ের দোকানে আড্ডা মারতাম। আমাদের আড্ডাটা এমনই জমতো যে, তা মাঝে মধ্যে মান্নাদে–র *কফি হাউজের আড্ডাকে*–ও হার মানাতো। একদিন আড্ডার আসরে না গেলে নিজের কাছে অস্থির মনে হতো।

এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর নিজেকে আর ভিন্নবাসী মনে হতো না। একদিন বিকেলে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে, চার দোকানের ওপারের রাস্তা দিয়ে একটি মেয়ে প্রার্থনাভঙ্গিতে বই–খাতা ধরে খুব লাজুক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তার লাজুকতা আরো বেড়ে যায় যখন সে আমাদেরকে ক্রস করে। মেয়েটি অপ্সরী না হলেও মোটামুটি সুন্দরী। বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা খেলাম। নিজের কাছে মনে হতে লাগলো, বিধাতা কি এর সঙ্গেই আমার নিয়তি লিখে রেখেছে! না হলে কেন তাকে দেখে আমার এই রকম হলো। কলেজে তো কতো রকম মেয়েই দেখি। কিন্তু তাদের কাউকে দেখে তো আমার এই রকম অস্থির মনে হতো না।

বেশ কিছুদিন এভাবে নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থেকেছি। বন্ধু–বান্ধব ঠিকই ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো যে, ওই মেয়েটির প্রতি আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। তারা আমাকে উপদেশ দিল, প্রথমে তার পেছনে ঘুরে ঘুরে বোঝাতে হবে যে, আমি তাকে পছন্দ করি বা তার প্রেমে পড়েছি।

শুরু হলো আমার অভিযান। রোজ বিকেলে তার বাসার সামনে দিয়ে সাইকেলে করে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে আমাকে কোনো সমস্যায় পড়তে হতো না। কারণ আমার বন্ধুরা সবাই ছিল স্থানীয়। এভাবে কয়েক মাস ঘুরে ঘুরে তাকে বোঝাতে সক্ষম হলাম যে, তাকে আমি পছন্দ করি।

একদিন পড়তে যাওয়ার সময় তাকে রাস্তায় বললাম, তোমার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই।

কিন্তু সে বিরক্ত স্বরে বললো, আমি চাই না। দয়া করে সরে দাড়ান।

আমি আর এগোতে পারিনি একটা অজানা ভয়ে। তারপরও হাল ছাড়িনি। এভাবে কয়েক মাস কেটে গেল শুধু দূর থেকে দেখে। কথাই বলে না। প্রেমিকার বাড়ির কুকুরটাকেও ভালো লাগে! আমার অবস্থাও হলো তাই। মাঝে মধ্যে তার দেখা না পেলে ছাদের ওপর তারে টানানো কাপড় দেখেই শিহরিত হতাম।

এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর বন্ধুরা বললো উঠিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু আমি এতে রাজি হইনি। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, একদিন না একদিন তার হৃদয়ে জায়গা করে নেবোই।

এভাবে সময় যেতে যেতে চলে এলো ঈদ। ঈদের আগে শহরের নিউ মার্কেটে প্রচণ্ড রকম ভিড় থাকে। একদিন আমি আর আমার এক বন্ধু গেলাম নিউ মার্কেটে একটা পাঞ্জাবি কিনবো বলে। সাইকেল স্ট্যান্ড করা মাত্রই আমার চোখ আটকিয়ে গেল সামনের দোকানের দিকে। একি! এ যে আমারই স্বপ্নের রাজকন্যা। তাকে দেখমাত্রই আমার আলঝেইমার রোগীর মতো সমস্ত স্মৃতি বিলোপ হতে লাগলো।

সাইকেলটা স্ট্যান্ডে রেখে তার পেছনে পেছনে ঘুরতে লাগলাম। দুই একবার চোখাচোখি হলো। কিন্তু তাতে কোনো উত্তাপ ছিল না। তারপর তার মায়ের সঙ্গে রিকশায় উঠে চলে গেল। আমি ঘুরে এসে আগের জায়গায় আসতেই আমার শিরদাড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমার সাইকেল নেই। দিকবিদিক হয়ে এদিক–ওদিক ছোটাছুটি করলাম। কিন্তু কোথাও পেলাম না। তাকে দেখার পর তালা লাগাতে ভুলে গিয়েছিলাম তাই এই যন্ত্রণা। মন খারাপ করে কয়েকদিন কাটালাম।

এরপর একদিন পড়তে যাওয়ার সময় বললাম, আজকে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। তুমি না বললেও আমার কথাগুলো তোমাকে শুনতেই হবে।

অবশেষে বললো, বলুন। তবে সংক্ষেপে।

গত পরশুদিন নিউ মার্কেটে তোমাকে দেখার জন্য আমার প্রাণপ্রিয় সাইকেলটা হারিয়ে ফেলেছি। কথাগুলো বলার সময় আপনাআপনিই আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল।

সে আমার চোখের পানি মুছে দিয়ে বললো, কিছু পেতে হলে কিছু হারাতে হয়।

মুহূর্তেই আমার সাইকেল হারানোর সমস্ত কষ্ট উবে গেল। অবশেষে যাওয়ার সময় বলে গেল ঈদের দিন বিকাল পাচটায় পানির ট্যাংকের নিচে থাকার জন্য।

এতো ঘটনার পর বন্ধুরা আমার প্রেমের নাম দিল *সাইকেল প্রেম।*

*শেখপাড়া, চুয়াডাঙ্গা থেকে*

# স্বপ্ন, পিরিতি আইন ও একটি স্লিপ

– হিজল

**স্বপ্ন**

হঠাৎ করেই আমার প্রিয় দুই নেত্রীকে নিয়ে এক মজার স্বপ্ন দেখে ফেললাম। ভালোবাসা দিবসের স্বপ্ন। প্রথমেই আমি খালেদা জিয়ার শুভেচ্ছা বার্তা এবং উপহার সামগ্রী নিয়ে হাজির হলাম শেখ হাসিনার বাড়ি। পরবর্তী কালে শেখ হাসিনাও সৌজন্যমূলক তার সামগ্রী পাঠালেন খালেদা জিয়াকে আমার মাধ্যমেই। স্বপ্নটি আপনাদের জন্য উপস্থাপন করছি:

গোলাপ আর রজনীগন্ধ্যায় সাজানো মস্ত বড় একটি ঝুড়ি। ঝুড়িতে অনেকগুলো চকলেট, ভ্যালেনটাইনস কার্ড আর যায়যায়দিনের একটি ভালোবাসা সংখ্যা এবং *নৌকা* প্রতীকযুক্ত একটি শাড়ি। কলিংবেল টিপতেই শেখ হাসিনা নাতিশীতোষ্ণ মেজাজে দরজা খুলে দিলেন।
বললাম, গুড মর্নিং ম্যাডাম, খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে ভালোবাসা দিবসে শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।
বিরস মুখে তিনি ঝুড়িটি হাতে নিলেন এবং কার্ডটি খুলে পড়া শুরু করলেন। কার্ডে লেখা :

*প্রিয় শেখ হাসিনা,*
*ভালোবাসা দিবসে রজনীগন্ধার শুভ্রতার শুভেচ্ছাসহ অনেক ভালোবাসা। সুস্থ ও সুন্দর থাকুন। শুভ প্রত্যাশায় –*
*–খালেদা জিয়া*
*১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩।*

আমি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ড্রইংরুমে বসে আছি। ঠিক ত্রিশ মিনিট পর চমকনেত্রী শেখ হাসিনাও একটি ফুলের ঝুড়ি নিয়ে হাজির হলেন। সঙ্গে কতোকগুলো চকলেট, কার্ড এবং ভদ্রতাবশত একটি শিফন শাড়ি। পাচ মিনিটের মধ্যেই উপস্থিত হলাম খালেদা জিয়ার বাড়ি।
খালেদা জিয়াকে বললাম, ম্যাডাম, শেখ হাসিনাও আপনার জন্য শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। নিন, গ্রহণ করুন।
খালেদা জিয়া সহাস্যে শুভেচ্ছা সামগ্রী গ্রহণ করলেন এবং কার্ডটি হাতে নিয়ে পড়া শুরু করলেন:

*প্রিয় খালেদা,*
*আপনি আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন। স্থূল কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচনে হারিয়েছেন। আর কতো? এদিকে নেই স্বামীর ভালোবাসা, অন্যদিকে নেই সাধারণ মানুষের। আর আপনি ভালোবাসা দিবসে ভালোবাসার ফুলঝুরি ছড়াচ্ছেন! নিকুচি করি আপনার ভালোবাসার। সুস্থ, সুন্দর আপনিই থাকুন। আমার দরকার নেই। ধন্যবাদ।*
*–শেখ হাসিনা*

*১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩।*

...এই খোকন ওঠ, কতো বেলা হয়েছে। মায়ের মিষ্টি ডাকের সঙ্গে সঙ্গে আমারও মিষ্টি মধুর স্বপ্নটির এখানেই সমাপ্তি ঘটলো।

**পিরিতি আইন ২০০৩**

চলতি বছর বাংলাদেশ প্রেম বিষয়ক পার্লামেন্ট *পিরিতি ভবন* থেকে সকল প্রেমিক–প্রেমিকাদের জন্য কতিপয় শর্তারোপ করে একটি আইন পাস হয় – যা *পিরিতি আইন–২০০৩* নামে পরিচিত। উক্ত আইনের যে কোনো একটি কোনো যুগল অমান্য এবং এর সীমা লঙ্ঘন করলে উক্ত প্রেমিক–প্রেমিকাদের প্রত্যেককে দেড় টাকা জরিমানাসহ সর্বোচ্চ দেড় ঘণ্টা কারারুদ্ধ করার বিধান রয়েছে। আসুন উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো জেনে নিই।

**এক.** *প্রেমের মরা জলে ডোবে না* এই পূর্বোক্ত ধারণা পাল্টে একশ পারসেন্ট বিশ্বাস করতে হবে প্রেমের মরাই সবার আগে জলে ডোবে।

**দুই.** পার্কে, ইউনিভার্সিটিগুলোর ঝোপ–ঝাড় বাদে যুগলদের বসতে হবে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন সবার গোচরে। এক্ষেত্রে ধর্ষণ মানিকের মতো অন্য কিছুতে বেপরোয়া হওয়া যাবে না।

**তিন.** কোনো যুগল যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে কথা বলে সেটটি গরম করে ফেলেন তবে উক্ত আইনের সাতাশ নাম্বার ধারায় সেই সেট এবং উক্ত যুগলের মনের লাইন মুহূর্তেই বিচ্ছিন্ন করতে আইন প্রণেতারা বাধ্য থাকবেন।

**চার.** খাওয়া–দাওয়ার ক্ষেত্রে দুজনকেই শেয়ার করতে হবে। শুধু প্রেমিকের টাকায় চায়নিজ খেয়ে খেয়ে *মেদ–ভুড়ি* বানালে এক্ষেত্রে নায়িকাকে অর্থাৎ সেই ধুমসি প্রেমিকাকে সঙ্গে সঙ্গে *মেদ–ভুড়ি কি করি* দাওয়াখানায় নিয়ে অবশ্যই মেদ কমানোর কথা উক্ত আইনে জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

**পাচ.** যদি কোনো উচ্ছৃঙ্খল প্রেমিক রাস্তায় কোনো তরুণীকে টিস করে শিষ মারে এবং ডাস্টবিন মার্কা ভাষা ব্যবহার করে শাড়ির আচলে টান মারে তাহলে উক্ত রাস্তার প্রেমিককে সেই সুন্দরীর শাড়ি গলায় পেচিয়ে জনসম্মুখে গাছে লটকানোর কথাতে উক্ত ধারাগুলোতে পরিচ্ছন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

**ছয়.** প্রেমিক ছেলে প্রেম করে বিয়ে করলেও শাশুড়ি যদি চিরাচরিত মুখে ঘরের ভেতরেও বেফাস কথাবার্তা বলেন তাহলে উক্ত আইনে আইনজীবী প্রেমিকা বৌমা দ্বারা উক্ত শাশুড়িকে কড়া ভাষায় মার্জিত ও রুচিশীল কথাবার্তা শেখানোর নিয়ম কোনোরূপ কারচুপি ছাড়াই আইনে স্পষ্ট লিখিত রয়েছে।

**সাত.** একটি চুমু দশ সেকেন্ডের উর্ধে হওয়া যাবে না। কারণ দীর্ঘ স্থায়ী চুমুর অতি ভোল্টেজে প্রেমিক বেচারার সুইসাইড খেয়ে আত্মহত্যার আশংকা রয়েছে। প্রেমিকাদের এক্ষেত্রে উক্ত আইনের ৫৪ (চুয়ান্ন) নাম্বার ধারায় সর্বোচ্চ সাবধান হতে বলা হয়েছে।

**আট.** যত্রতত্র একে অপরকে গিফট দেয়া যাবে না। অবশ্য যাদের বাবা, মামাদের সরকারি চাকরিতে দুর্নীতির মাধ্যমে উপরি মাল কামানোর সুযোগ রয়েছে তাদের জন্য এ ধারাটি অবশ্যই অগ্রহণযোগ্য।

**নয়.** প্রেমিকাকে রিকশায় নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় হঠাৎ যদি প্রেমিকার নিষিদ্ধ অঞ্চলে কোনো হাত চুলকানো প্রেমিক হাত রাখেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে নায়িকার সামনেই উক্ত প্রেমিক নায়ককে সেনাবাহিনী দ্বারা পুরোপুরি পর্যুদস্ত করা জায়েজ বলে আইনে উল্লেখ রয়েছে।

**দশ.** আইন কার্যকর পরবর্তী সময়ে দেশের শ শ অজ্ঞাত সিডি রোকন পুনরায় যদি কোনো নামকরা কলেজ পড়ুয়া প্রেমিকাকে ইয়ে করে সিডি বের করেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে উক্ত লুচ্চা ন্যাংটো রোকনদের লিঙ্গে সবচেয়ে শস্তা কনডম (রাজা) পরিয়ে পুরো ঢাকা শহর অবশ্যই ঘোরানোর নিয়ম আইনের ধারা বিবরণীতে লিখিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

**এগারো.** মনের ওপর জোর চলে না। এ সত্ত্বেও কোনো সন্ত্রাসী প্রেমিক যদি কোনো তন্বী তরুণীকে জ্বালাতন করেন, এসিড সন্ত্রাসের ভয় দেখান তবে উক্ত ভণ্ড প্রেমিকদের প্রত্যেককে এক গ্লাস করে ঘন সালফিউরিক ($H_2SO_4$) এসিডের শরবত খাইয়ে ভেতরটা ঠাণ্ডা করানোর নিয়ম অবশ্যই বত্রিশ নাম্বার ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

**সর্বশেষ :** তবে হ্যা, ব্যতিক্রম শুধু ১৪ ফেব্রুয়ারি। এদিন একটা থেকে একশটা পর্যন্ত প্রেমের অফার করা যাবে। প্রেমিক–প্রেমিকারা পরস্পর পরস্পরের বাড়িতে ট্রাক ট্রাক গোলাপ, চকলেট পাঠালেও কোনো ক্ষতি নেই। তখন একটি কিস–এর স্থায়িত্ব হতে পারে পৃথিবী জন্মের শুরু থেকে পরবর্তী এই বর্তমান সময় পর্যন্ত। ফোনে কথা বলতে বলতে যদি তাপে ফোন সেটটি গলেও যায় তবুও কোনো দোষ নেই। সর্বোপরি জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে এমন কোথাও এদিনটিতে এখানে I Love You বলা নিষেধ এ জাতীয় কোনো সাইনবোর্ড থাকবে না।

তাই প্রিয় প্রেমিক–প্রেমিকারা, এদিনটিতেই বাধনহারা যুগলপাখি হয়ে যান আপনারা। আকাশে, বাতাসে উড়ে বেড়ান খুশিতে, আনন্দে আর নিখাত পরিপূর্ণ স্বর্গীয় ভালোবাসায়।

**স্লিপ**

২০০০ সাল। অনার্সে পড়ি। হালকার ওপর ঝাপসা থেকে মিলির সঙ্গে তখন আমার ফাটাফাটি রকমের প্রেম। ময়নামতি পিকনিক সেরে খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন বাস থেকে নামছিলাম চট করে মিলি আমার হাতে একটি স্ট্যাটিসটিকসের স্লিপ ধরিয়ে দিল। তাতে লেখা :

- চোখ টিপ মেরেছিস – সাতাশ বার।
- ইশারায় কাছে ডেকেছিস – আট বার।
- স্ন্যাপ নিয়েছিস – ষোলটি।
- হাত ধরে বসেছিলি – বত্রিশ মিনিট একত্রিশ সেকেন্ড।
- চুরি করে ঠোটে চুমু খেয়েছিস – তেরো বার।
- প্রতিটি চুমুর সময়কাল – দুই সেকেন্ড।
- সুমনাকে দিয়ে কাছে ডেকেছিস – পাচ বার।
- বাসের ভেতর ইচ্ছা করেই ওপরে পড়েছিস – তিন বার।
- পার্টস থেকে নিয়েছিস – একশ পঞ্চান্ন টাকা মাত্র।
- পেটে কাতুকুতু দিয়েছিস – ছয় বার।

● ব্রা–র ফিতায় টান মেরেছিস – চার বার।
● চিমটি কেটেছিস – দুই বার।
● গান শুনিয়েছিস – তিনটি।
● বাদাম খেয়েছিস – আঠারো টাকার।
● চুল ধরে টান দিয়েছিস – তিন বার (জোরে)।
● চুয়িং গাম খেয়েছিস – পুরো দুই প্যাকেট।
● ওই জায়গায় হাত রেখেছিস – নয় বার।
● গালে টোকা মেরেছিস – একবার (আস্তে করে)।
● এবং শাড়ির আচলে তোর ঘর্মাক্ত পটল মুখকানি মুছিয়ে দিয়েছি – তিন বার।

...সব কিছুর বিনিময়ে আমি শুধুই তোর ভালোবাসা চাই।

*দক্ষিণ শ্যামপুর, সাভার থেকে*

# অটোগ্রাফ

– মিল্টন রোজারিও

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২–এ আমি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হই। ইতিমধ্যে যাযাদির ভালোবাসা দিবসের যাবতীয় শর্ত পূরণ করে আমি অনুষ্ঠানের একজন অংশগ্রহণকারী।

পরদিন ১৪ ফেব্রুয়ারি সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠি। অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হই। সঙ্গে আমার বন্ধু। অপেক্ষা করতে থাকি কখন জলির ফোন আসবে। হোটেলে নাশতা করার সময় মোবাইলটা বেজে উঠলো। খুশিতে আমার মনের ঘণ্টাও বেজে উঠলো। বন্ধু হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে কোনো উত্তর নেই। তখন বন্ধুটি আমাকে মোবাইল দিল। আমি হ্যালো বলতেই এবার ওপাশ থেকে প্রশ্ন, কবে এসেছি ঢাকা? কতোদিন থাকবো? দেখা করবো কি না, কখন যাবো অনুষ্ঠানে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যখন শুনতে চাইলাম অতি প্রত্যাশিত কথা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। বললো না।

এমন একটা শুভদিনে অন্তত একবার শুনতে চেয়েছিলাম। কেননা জলি শুধু চিঠিতে লেখে, মুখে কখনো কথাটা বলতো না। পরে জেনেছিলাম দোকানে লোকজন ছিল। তাই বলেনি।

যাই হোক। লেডিস ক্লাবে পৌছাতে নির্ধারিত সময়ের একটু বেশি সময় নিয়েছিলাম। মনটা ফুরফুরে ছিল। তাই দেরি হওয়ার জন্য যে কোনো কথা শুনতে প্রস্তুত ছিলাম। অনুষ্ঠানে নিজের পরিচয় পত্রটা তুলে বরণের মাধ্যমে সেদিনের মতো ভালোবাসার মুকুট পরে রাজা হয়ে গেলাম। প্রকৃতপক্ষে সেদিন আমি শ্রেষ্ঠ ও সুখী রাজা ছিলাম। যদিও রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন অন্য একজন। অনুষ্ঠানে বড় বড় শিল্পী, অভিনেতা, ব্যক্তিত্ব, রাজনীতিবিদ উপস্থিত ছিলেন। এতে বড় মাপের মানুষ কখনো এক সঙ্গে দেখিনি। তাই বোকার মতো বসে শুধু তাদের দেখছিলাম। হঠাৎ মনে হলো অটোগ্রাফ নিতে হবে। এজন্য অটোগ্রাফ নেয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লাম। কিন্তু হতাশ হতে হলো।

সম্পাদক শফিকস্যার বললেন, এখন না, পরে। তারপরও শবনম মুশতারী, আবদুন নূর তুষার অটোগ্রাফ দিলেন। প্রথমজন আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়জন কেন বিরক্ত হয়েছিলেন সে রহস্য আজও জানি না। বৌ সঙ্গে থাকায় কি ভাব নিচ্ছিলেন?

শেষ বিকেলে সুযোগ হলো শফিকস্যারের কাছাকাছি যাবার। স্যার খুবই আন্তরিকভাবে জিজ্ঞাসা করলেন কার উদ্দেশ্যে লিখবো? একটুও দ্বিধা না করে সরাসরি জলির কথা বললাম। স্যার এবার লিখলেন –

*জলি আমার প্রিয় বন্ধুর স্ত্রীর নাম।*

*জলি, আমি খুশি হবো যদি তুমি মিল্টনের বন্ধু হও।*

অটোগ্রাফটা বাড়ি এনে ল্যামিনেট করলাম। জলি ছুটিতে এসে দেখে নিয়ে নিল। তার দাবি, শফিকস্যার আমাকে লিখেছে।

এবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩–এ আমি কোথায় থাকবো নিজেই জানি না। ইতিমধ্যে অনেক কিছুই ঘটেছে। শুধু এটুকু জানাতে পারি, সম্পর্ক আগের মতো নেই। এখন আর জলি চিঠিও দেয় না, ফোনও করে না। কবে ঢাকা গেলাম আর কবে এলাম তা জলি জানে না, জানতেও চায় না। স্যারের অটোগ্রাফটা ফিরিয়ে দিতে বলেছিলাম। দেয়নি এবং দেবে না বলে জানিয়েছে।

*পূর্ব মহিষবাথান, রাজশাহী থেকে*

# গবাকান্ত

– ইমরান

পেট ভরা স্বপ্ন এবং মাথা ভরা উর্বর সার নিয়ে বহু কষ্টে ভর্তি হয়েছিলাম বুয়েটে। বিলিভ ইট অর নট। লেখাপড়া করার জন্য হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক না কেন, ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই সব ছেলেরাই একটি কমন স্বপ্ন দেখতে থাকে আর তা হলো, একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা। আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

কিন্তু প্রেমের অফার তো দূরের কথা, কোনো মেয়ে এসে পরিচয়টা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলো না।

কি লাভটা হলো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে? একটা প্রেমও করতে পারলাম না।

তিনটা টার্ম পার করার পর হঠাৎ এক কোকিলের ডাক শুনে পুলকিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেলাম যে আমাকে ডেকেছে সে কোকিল কণ্ঠি হলেও চেহারায় একটা কাউয়া। কিন্তু হাজার হলেও এটাই তো আমার জীবনে প্রথম কোনো পক্ষীর আহ্বান।

আমার পরিচয় জানতে চাওয়ায় দুই তিনটা হার্টবিট মিস করলাম। পরিচয় পেয়ে সে একটা পেপসোডেন্ট মার্কা হাসি উপহার দিয়ে আমারই এক বন্ধুকে খুজে বের করার অনুরোধ জানালো। বিস্ময়ের ধাক্কা কোনোমতে কেটে উঠে সারা ইএমই ভবন ঘুরে বন্ধুকে বের করলাম।

ভাগ্যবান (!) বন্ধুর হাত ধরে চলে যাওয়ার সময় মিস কাউয়া এই গবাকান্তকে একটা থ্যাংক ইউ–ও উপহার দিল না। মেয়েরা এমনই হয়।

মহাউৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে লেভেল পূর্তি অনুষ্ঠানে অংশ নিলাম। যাত্রা অনুষ্ঠানে আমাকে দেয়া হলো বিপত্নীক মন্ত্রীর চরিত্র যার কাজ হলো, দাড়িয়ে দাড়িয়ে রাজপুত্র ও রাজকন্যার প্রেমদৃশ্য দেখা। আসলে প্রেমিকের চরিত্রে অভিনয়ের জন্যেও কপাল লাগে। আমার মতোই হতভাগ্য আরেক যুবকের গল্প দিয়ে লেখার ইতি টানবো।

প্রেমে প্রত্যাখ্যাত এক যুবক গভীর দুঃখ বুকে নিয়ে লেকের ধারে হাটছিল। রাত তখন নয়টা দশটা হবে। এমন সময় হঠাৎ কোথেকে এক কিম্ভুত দর্শন বুড়ি এসে হাজির। বুড়ির মাথায় তিন কোণা টুপি, হাতে লম্বা লাঠি, পরনে বিচিত্র পোশাক।
কি হে ছোকরা, একা একা ঘুরছো কেন? সমস্যায় পড়েছো?
পড়লেই বা কি? আপনি তো কোনো সাহায্যে আসবেন না। বললো যুবকটি।
কে বলে আসবো না? ডাইনিদের অসাধ্য কিছুই নেই।
বুড়ির পরিচয় জানতে পেরে যুবকটি বেশ ঘাবড়ে গেল। বুড়ির পোশাক–আশাক দেখে ডাইনি বলেই মনে হচ্ছে। সাহস করে সে তার সমস্যার কথা খুলে বললো।
সব শুনে বুড়ি বললো, এতো কোনো ব্যাপারই না। কালকেই তোমার সঙ্গে ওই মেয়ের প্রেমের ব্যবস্থা করছি। কিন্তু একটা শর্ত আছে।
কি শর্ত?
আজ রাতটা তোমাকে আমার সঙ্গে কাটাতে হবে।
এ প্রস্তাবে যুবকটি রাজি হয়ে গেল। ডাইনির জাদুর মায়ায় হয়তো প্রিয়াকে আপন করে পাওয়া সম্ভব হবে। তার স্বপ্ন সফল হবে।
বুড়িকে নিয়ে সে একটি হোটেলে উঠলো।
সারা রাত তারা এক সঙ্গে কাটালো।
পরদিন সকালে যুবকটি বললো, ডাইনি বুড়ি, তোমাকে খুশি করেছি। এবার আমার প্রেমের ব্যবস্থা করে দাও।
বুড়ি হেসে প্রশ্ন করলো, তোমার বয়স কতো বলো তো?
পচিশ। যুবকটি উত্তর দিল।
এই বয়সেও তুমি রূপকথার ডাইনি বুড়িতে বিশ্বাস করো? হাঃ, হাঃ।
বুড়ি বিকট শব্দে হেসে উঠলো।

*ঢাকা থেকে*